মহান নেতা
মাওলানা ভাসানী

মহান নেতা
মাওলানা ভাসানী

অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রহমান

মহান নেতা মাওলানা ভাসানী
অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রহমান
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ* তারুণ্য তাওহীদ
বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ।
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ২০০/- (দুইশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৭-৯৯৩৩৩-২-৮
ISBN: 978-987-99333-2-8

Mohan Neta Mawlana Vasani By Professor Sayed Abdur Rahman , Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.; Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025; Copy Right:Writer; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer; Price: 200/- (Two Hundred Taka Only); ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

যারা ভাসানীর আদর্শ হৃদয়ে লালন করে
দেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত
তাদের তরে।

সম্পাদকীয়

এক মহান নেতা ছিলেন মাওলানা ভাসানী। ইতিহাসে তিনি আজ জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। উপমহাদেশের রাজনীতিতে এবং বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি ছিলেন মজলুম মানুষের নেতা। ব্রিটিশ বেনিয়াদের অত্যাচার থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি সারা জীবন সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, কৃষক, শ্রমিক, মজুরের দুঃখ-দুর্দশা, জমিদারদের অত্যাচার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কারণে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ও আসামের কৃষক সমাজ এই বিপ্লবী নেতাকে 'মজলুম জননেতা' উপাধিতে ভূষিত করেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তার চিন্তা ছিলো সুদূর প্রসারী। ভাষা আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক এবং বিবিস জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তালিকায় অষ্টম হন। এই অবিস্মরণীয় নেতাকে নিয়ে লিখতে গেলে শেষ হবে না। 'মহান নেতা মাওলানা ভাসানী' গ্রন্থটিতে যারা প্রবন্ধ দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ছায়ানীড়কে সাধুবাদ এই মহতী কর্মে আমাকে সহায়তা করার জন্য। গ্রন্থটি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

– সম্পাদক

সূচি

কৃষক আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা ❑ ১১
সৈয়দ আবুল মকসুদ

ভাসানচরের ভাসানী ❑ ১৫
সুফিয়া আখতার

মাওলানা ভাসানী হক্কুল এবাদ মিশন:
ভুলে যাওয়া মহীপুর প্রান্তর ❑ ২১
এম.এ. আজাদ সোবহানী আল ভাসানী

মাওলানা ভাসানীর রূহানী রাজনীতি ❑ ২৬
অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন

সন্তোষকে নিয়ে মাওলানা ভাসানী হুজুরের স্বপ্ন ❑ ৩৪
অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রহমান

মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও তাঁর ব্যক্তি-জীবন ❑ ৩৭
সৈয়দ ইরফানুল বারী

মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর
জীবন ও কর্ম ❑ ৪৪
অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান

একজন মাওলানা ভাসানী ❑ ৫২
সুলতানা রুবী

মওলানা ভাসানীর শিক্ষাদর্শন ❑ ৫৫
আল রুহী

মওলানা ভাসানীর সমাজতান্ত্রিক দর্শন
ও জুলাই অভ্যুত্থান প্রেক্ষিত ❑ ৫৯
মো. এনায়েত করিম

কৃষক আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বিংশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে মওলানা ভাসানী জাতীয় রাজনীতিতে বিরাট কোনো ভূমিকা পালন না করলেও এই সময়ই তিনি বাংলা ও আসামের সামন্তবাদ ও মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি বিশাল কৃষক সমাবেশ করেন পূর্ববঙ্গ ও আসামে। এই সকল সমাবেশের অকল্পনীয় সাফল্যের পরেই তিনি একজন কিংবদন্তি কৃষক নেতা রূপে পরিচিত হন। ভাসানীর আগে বাংলাদেশে যারা কৃষক- আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে কেউই কৃষকের প্রতিনিধি ছিলেন না, অথবা তারা কেউই কৃষকের কাছের মানুষ ছিলেন না। ময়মনসিংহে যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে মুসলিম লীগ নেতাদের উদ্যোগে তাতে ভাসানী যোগ দিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়েই। ওই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত, বিত্তশালী ও জমিদার শ্রেণির মানুষ যদিও বাহ্যত জমিদারদের বিরুদ্ধে ছিলো সে সম্মেলন। স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২),খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৭৬-১৯৬৮) প্রমুখ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে-সম্মেলনে।

মওলানা ভাসানী কর্তৃক আয়োজিত প্রথম ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কাওয়াখালি নামক এক স্থানে। ওই সম্মেলনের পরে তার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, যদিও কলকাতার খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী পত্রিকাগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সেই সম্মেলনের খবর প্রচার করেনি। মুসলমানদের কাগজগুলোতে বেশ লেখালেখি হয়েছিলো। আবুল মনসুর আহমদ তার স্মৃতিকথায় সিরাজগঞ্জের সেই কৃষক সম্মেলনটি সম্পর্কে লিখেছেন: এই সম্মেলনী নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির উদ্যোগে হয় নাই। মওলানা ভাসানী নিজের দায়িত্বেই ডাকিয়েছিলেন। সুতরাং ইহা একটি জেলা প্রজা সম্মেলনীতেই পর্যবসিত হইত কিন্তু একটা বিশেষ ঘটনায় এই সম্মেলনী সারা দেশীয় গুরুত্ব লাভ করিল। সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও. মাওলানা ভাসানী ও সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বরদের উপর ১৪৪ ধারা জারি করিলেন। শহীদ সাহেব, মোমিন সাহেব এই লইয়া গভর্নরের সহিত দরবার করেন । শেষ পর্যন্ত গভর্নর এসডিও-র আদেশ বাতিল করান। এই ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার প্রায় সকল জিলা হইতে প্রজা কর্মীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সম্মিলনীতে যোগদান করে। গিয়া দেখি এলাহি কারখানা, সম্মেলনী তো নয়, একেবারে কুম্ভমেলা। জনতাকে জনতা লোকের মাথা লোকে খায়, হয়তো বা লক্ষ লোকই হইবে। সদ্য ধানকাটা ধানক্ষেত সমূহের সীমাহীন ব্যাপ্তি, যতদূর নজর যায় কেবল লোকের অরণ্য। এই বিশাল মাঠের মাঝখানে প্যান্ডেল করা হইয়াছে। প্যান্ডেল মানে একটা চারিদিক খোলা মঞ্চ। উপরে একটি শামিয়ানা। সেই বিশাল জনতার মাথায় সে শামিয়ানাটা যেন একটা টুপিও নয়, টিকি মাত্র। সম্মেলনীর কাজ শুরু হইবার অনেক দেরি ছিল। মনে হইল একবার ডেলিগেট ক্যাম্পটা ঘুরিয়া আসি। আমার জেলার সহকর্মী ডেলিগেটরা সেখানে ছিলেন। আমি নিজে আমার এক বন্ধুর অনুরোধে তার শ্বশুর বাড়িতে মেহমান হইয়াছিলাম। কাজেই সহকর্মীদের তত্ত্বতালাস লওয়া কর্তব্য। ডেলিগেট ক্যাম্পে দেখিলাম স্বয়ং মওলানা সাহেবই ডেলিগেটদের খোঁজ খবর করিতেছেন। মওলানা ভাসানী সাহেবের সহিত এই আমার প্রথম পরিচয়। মওলানাকে ভাবিয়াছিলাম ইয়া বড় বুড়া পীর। দেখা পাইলাম এক উৎসাহী আর কি? আলাপ করিয়া খুশি হইলাম। হাসিখুশি মেজাজ। কর্মচঞ্চল অস্থিরতার মধ্যেও একটা বুদ্ধির দীপ্তি ও ব্যক্তিত্ব দেখিতে পাইলাম।

যথাসময়ে সম্মেলনী শুরু হইল। সমবেত জনতার এক- চতুর্থাংশ লোক প্যান্ডেলের চারপাশে ঘিরিয়া বসিল। মঞ্চোপরে বসিয়া চারদিকে চাহিয়া অবাক হইলাম। জনতার তিন-চতুর্থাংশ লোক কচুরিপানার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাকি মাত্র এক-চতুর্থাংশ লোক সভায় বসিয়াছে। তবু সভার আকার এত বিশাল যে উহাদের সকলকে শুনাইয়া বক্তৃতা করিবার মতো গলা অনেক নেতারই নাই।

যা হোক সম্মেলনীর কাজ সাফল্যের সহিত সমাধা হইল। খান বাহাদুর মোমিনের ডিকটেশনে আমার হাতের লেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্মিলনীতে গৃহীত হইয়াছিল। ঐসব প্রস্তাবের মধ্যে জমিদারী উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নজরসেলামি বাতিল, জমিদারের প্রিয়েমশানাধিকার রদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ, চক্রবৃদ্ধি সুদ বেআইনী ঘোষণা ইত্যাদি কৃষক খাতকের স্বার্থে মামুলি দাবিসমূহতো ছিলোই। তার উপরে ছিলো দুইটি নয়া প্রস্তাব। কয়েক মাস আগেই ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড নামে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাহির হইয়াছিল। সকল দলের হিন্দুরা উহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজেই আমাদের নেতারা মনে করেছিলেন, আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার। অতএব রোয়েদাদের সমর্থনে প্রস্তাব পাস হইল। অপরটি ছিলো কৃষিখাতকদের ঋণ আদায়ের উপর মারটরিয়াম শব্দটা প্রথম শিখি। তারই উপদেশ মতো এই প্রস্তাবটিতো কৃষিখাতক ঋণের উপর দস্তর মতো একটা থিসিস লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল, বাংলার কৃষিখাতের ঋণের বোঝার প্রায় সবটুকুই চক্রবৃদ্ধি সুতরাং অন্যায়। উহা শোধ করার সাধ্য কৃষকদের নাই। মূলত উহারই উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালের বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন পাস হইয়াছিল এবং ১৯৩৭ সালে সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল ।

খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে সম্মেলন উদ্বোধন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তিনি তখন বাংলার উঠতি নেতাদের অন্যতম । সম্মেলনটি সম্পর্কে ভাসানী নিজে লিখেছেন:

১৩৩৭ সালে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে তিনদিনব্যাপী বঙ্গ আসাম প্রজা সম্মেলনে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে কৃষকদের ঋণের তালিকার যে কাগজ সংগ্রহ করা হয় তাহার ওজন ২০ মণ ২৭ সের হইয়াছিল। তিন দিনের সম্মেলনে ১৮ হাজার মণ চাউল, ৮৩২ টি গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি খরচ হইয়াছিল। ইহা আরব্য উপন্যাসের গল্প নহে। অতি বাস্তব ঘটনা ।

এই সম্মেলনের পর সরকার ভাসানীর ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হয়ে ওঠে। এই সময় বাংলার প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিব তার পাক্ষিক গোপন প্রতিবেদনে বড়লাটকে জানান যে, পূর্ববঙ্গে আবদুল হামিদ খান নামক একজন নেতার আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি সরকারের জন্য একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। মুখ্য সচিবের এই চিঠির কপি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস সংরক্ষণশালায় রক্ষিত রয়েছে।

কাওয়াখোলা সম্মেলনের কিছুদিন আগে ১৯৩২ সালেই আর একটি ‘কৃষকখাতক সম্মেলন’ করেছিলেন ভাসানী টাঙ্গাইলের চাড়াবাড়ির ঘাটে। সেখানেও ‘প্রায় দেড় লক্ষ কৃষকখাতক’ সমবেত হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাছাড়া অংশগ্রহণ করেছিলেন হিন্দু-মুসলমান অনেক নেতা। দু'দিন চলেছিল সে সম্মেলন। কৃষকরা নিজেরাই তাদের খাওয়া-দাওয়ার চালডাল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। টাঙ্গাইলে সভা-সমাবেশ করার বিরুদ্ধে ভাসানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সেজন্য তিনি টাঙ্গাইল পার্কের ঈদের জামাতকে কৃষক সম্মেলনে রূপ দেন। সেটা শুধু ঈদের জামাত ছিলো না, কারণ সেখানে অসংখ্য হিন্দু কৃষকও উপস্থিত ছিলেন। ভাসানীর নিজের ভাষায়, সেই ঈদের জামাতে “ মুসলমানদের জন্য খিচুড়ি ও হিন্দুদের চিড়া-দধি খাওয়ানো হয়।” সেই বিশাল আয়োজন এবং ভাসানীর ক্ষেপিয়ে তোলা ভাষণে ময়মনসিংহের জমিদার জোতদারদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু'সম্প্রদায়েরই ছিলো। ‘ঈদের জামাতের’ নামে সম্মেলন হয়েছিলো বলে প্রশাসনও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি সম্মেলন বানচাল করতে। জমিদার জোতদারদের ত্রাস ভাসানীকে আইনানুগ ব্যবস্থায় পরাস্ত করা ছাড়া তাকে হত্যারও চেষ্টা করা হয় যে জন্যে তিনি পূর্ববঙ্গে থাকাই আর নিরাপদ মনে করেননি।

শুধু জোতদার মহাজন জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচার নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে বাংলাদেশের সাংবাৎসরিক বন্যার সমস্যাও ভাসানীকে ভীষণ ভাবিত করতো। মানুষ যে কারণেই কষ্ট পাক মানুষের জন্যেই হোক বা প্রাকৃতিক কারণে হোক তাকে পীড়া দিতো। এক লেখায় তিনি বলেছেন:

১৩৩৭ সালের বন্যাও আমার কর্মজীবনে অনেকটা প্রভাব বিস্তারের দাবি রাখে। কারণ সন্তোষকে কেন্দ্রভূমি করিয়া আজও আমি রাজনৈতিক অঙ্গনে যে কাজ করিয়া যাইতেছি ইহা বাংলা ১৩৩৭ সনের বন্যার জের বৈ কিছু নয়। আমি সেই সনে টাঙ্গাইল আসিয়াছিলাম রিলিফের কাজে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম মোমেনশাহী জেলার জমিদারেরা, মহাজনেরা কীভাবে কৃষকমজুরকে শোষণ করিতেছে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত ‘৩০ ও ৪০’ এর দশকের পনেরো ষোলো বছর আসামই ছিলো তার প্রধান কর্মক্ষেত্র-ওই সময় বাংলাদেশে অল্প সময়ের জন্য এসেছেন কখনো কখনো।

লেখক : প্রয়াত বিশিষ্ট কলামিস্ট, লেখক ও ভাসানী

ভাসানচরের ভাসানী

সুফিয়া আখতার

জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার সয়া ধানগড়া বুনিয়াদি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা হাজী শরাফত উল্লাহ খান। তাঁর স্বজনেরা তাকে 'চেগা' নামে ডাকতে পছন্দ করতো। শৈশবে তিনি হামিদ অথবা চেগা নামে বিশেষ পরিচিত লাভ করেন। শৈশবে দুরন্তপনা অথবা বিচরণে পিতা শরাফত উল্লাহ খান বুঝতে পারলেন তার হামিদ ওরফে চেগা গায়ে গতরে বড় না হলেও মনের দিক দিয়ে অনেক বেড়ে ওঠেছে। তার কথার ফুলঝুরি শুনে বড়রা তাজ্জব হয়ে যেতো। বাড়ির বাইরে ছিল মক্তবঘর। ওস্তাদ মক্তবে সুর করে শতকিয়া,কড়াকিয়া, গনউকিয়া ও নামতা পড়ান। বাড়ির উঠানে খেলা করে চেগা, শতকিয়া পড়ার সুর তার কানে যায়। বিকালে সমস্বরে সঙ্গীদের সাথে খেলছে আর শতকিয়া পড়ছে একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ এবং একের পিঠে এক এগারো একের পিঠে দুই বারো,একের পিঠে তিন তেরো... । শরাফত উল্লাহ খান ছেলের মুখে এ ধরনের পাঠ শুনে হাসি দমন করতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন তার ছেলের জেহেন বেশ তাজা। এখন তাকে হরফ শেখানো দরকার। শরাফত উল্লাহ খান সাহেব ওস্তাদ জোনাব আলী সাহেবের নিকট পরামর্শ করেন। ওস্তাদ সাহেব হামিদের পিতাকে দিনক্ষণ দেখে হাতেখড়ির আনজামের পরামর্শ

দিলেন। সে আমলে মুসলিম বনেদি পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রথম অক্ষর পরিচয় করাতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। মুসলিম পরিবারের সবকের আয়োজন হতো খুব তাকিমের সাথে। যেদিন সবকের ব্যবস্থা হতো সেদিন বাড়িতে ঝাড়া মোছা, নিকানো গোছানো শুরু হতো, ছেলে- মেয়েদের গোসল দিয়ে নতুন জামা কোর্তা পরানো হতো। মাথায় দেয়া হতে টুপি। মেয়েদের পরানো হতো লাল চেলি, ওড়নার মত করে মাথায় লাল গামছা। ধোয়া মোছা শেষে মাদুরের উপর কেবলার দিকে মুখ করে বসানো হতো। ওস্তাদ সাহেব সামনেই জোড় আসনে বসে কিছু দোয়া কালাম 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ব' পড়ে তালবের লেমের বুকে ফুঁ দিতেন। কাগজের তৈরি তেলকা তালেব এলেমের হাতে ধরিয়ে দিতেন তারপর ওস্তাদ বলতেন বলো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম- আলিফ, বে, এলেম,আ, খাঁ..... বাড়ির ছেলে চেগা মিঞার শুভ সবকের দিনে শরাফত উল্লাহ খান গঞ্জ থেকে বড় বড় সব গোল্লার ব্যবস্থা করলেন। ফিরনি, পায়েস, চিনি পাতা দই ঘরেই তৈরি হলো। যথা সময়ে জোনাব আলী ওস্তাদ তশরিফ আনলেন। চেগা মিয়াকেও নতুন লুঙ্গী কোর্তা টুপি পরিয়ে শতরঞ্জির উপর বসানো হলো। তারপর চেগার হাতে দেয়া হলো কাগজের তৈরি তেলকা। জোনাব আলী ওস্তাদ বললেন, বলতো বাবা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। চেগা কোনো রাও করে না। হাজী শরাফত উল্লাহ খান ব্যস্ত হয়ে ছেলের মুখ উপরে তুলে বললেন, 'কওচেন বাবা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।' না। আমি এহন কমু না। ওস্তাদ তার দীর্ঘজীবনে এমন বহু ছেলে-মেয়েকে সবক দিয়েছেন। তার অভিজ্ঞতা থেকে বললেন আজ শুধু বিসমিল্লাহ বল। বল, বিসমিল্লাহ। - আমি সব কইবার পারি। চেগা মাথা খাড়া করে জবাব দেয় আজ কমু না। আব্বা এখন যাই বলে আসন ছেড়ে খেলার সাথীদের কাছে দৌড়ে যায়। ওস্তাদ হাজী শরাফত উল্লাকে বললেন, 'কাল যেন ওকে মক্তবে পাঠিয়ে দেন। আমি ওকে মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে পাঠে মনোযোগী করার কোশেস করবো।' যথা সময়ে চেগা মিঞা পরের দিন মক্তবে হাজির হলো। হাজী সাহেব বড় আশায় বুক বেঁধে চেগাকে মক্তবে লেখাপড়া করতে পাঠান। বছর খানিকের মধ্যেই পড়ালেখার প্রতি চেগার মনেযোগ বেড়ে গেল। মক্তবের ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই চেগা দুমুঠো ভাত মুখে দিয়ে ডোরাকাটা তহবন্দ ও কোর্তা গায়ে মক্তবে হাজির হয়। যতই দিন যায়, চেগা মিঞার পড়ালেখার প্রতি জোশ বাড়তে থাকে । চেগা মিঞার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন পিতা শরাফত উল্লাহ খান মারা যায়। পিতার মৃত্যুর পর বালক চেগা মিয়া মুষড়ে পড়ে। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগে শোকের গভীরতা তাকে মুহ্যমান করে তোলে। পিতা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। হাজী শরাফত উল্লাহর ইন্তেকালের পর খাঁ বাড়ি থমকে দাঁড়ায়। চেগার পড়াশুনার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে আম্মাজান, চাচা ইব্রাহীম, ওস্তাদ জোনাব আলী

নজরে রাখেন। ওস্তাদের নজরদারি ও দরদে চেগা মিঞা পড়াশুনায় মন দেয়। খেলার সাথী সহপাঠিরা যাকে ডাকে হাসু, মুজা, শুকরা, দিলু, আইছা ইত্যাদি জোনাব আলী ওস্তাদ হাজীরা খাতায় তাদের নাম ডাকেন- হাসমত আলী, মোজাম্মেল হোসেন, শুকুর উদ্দিন, দিলারা বেগম ও আছিয়া খাতুন ইত্যাদি। মক্তব জীবন থেকেই আবদুল হামিদের সহজ সরল ভাব কথা-বার্তা সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করতো। সঙ্গী সাথীরা এমন নেওটা হয়ে গেলো যে, আব্দুল হামিদ যেন ওস্তাদ তারা সকলেই সাগরেদ। কাসে মুখস্থ কবিতা বলার মধ্যে অনর্গল ও সাবলীল ভঙ্গিমা ছিল, যা সবাইকে আকৃষ্ট করতো। সে আমলে ধর্মীয় আসরে দূর-দূরান্ত থেকে আলেম ওলামা আসতেন। আবদুল হামিদ সেই ধর্মীয় আসরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। একবার ওস্তাদ ও জোনাব আলী সাহেব গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের আনজাম করলেন। বক্তা হোসেন পুরের মেহেরুল্লাহ। আবদুল হামিদ জীবনে প্রথম মুন্সি সাহেবের চেহারা, পোশাক দেখলেন। ওয়াজ নছিয়ত শুনলেন। যেমন দরাজ কণ্ঠ তেমনি সুমিষ্টি সুর। বালক আবদুল হামিদ নিবিষ্ট মনে ওয়াজ শুনলেন। পরের দিন আবদুল হামিদ সকাল সকাল মক্তবে গিয়ে হাজির হলো। অনেক ছাত্র-ছাত্রীও উপস্থিত হয়েছে। একটি ছেলে আবদুল হামিদকে লক্ষ্য করে বললো- কাল খুব ভাল ওয়াজ হইছে, নারে? কি ওয়াজ হইছে কইবার পারোস? তুই পারোস? আবদুল হামিদ বলে পারমু না ক্যান? তয় ক'চেন? আবদুল হামিদ গলা খাকারি দেয়। তারপর সত্যি সত্যি ওয়াজ শুরু করে - বেরাদানে ইসলাম। আছছালামু আলাইকুম। লাখো তারিফ আল্লাহর। লাখো শুকরিয়া তার দরবারে। হাজারো দরুদ তাঁর প্রেরিত নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উপর বলে শুরু করে হাজিরানে মজলিশ ভাই ও বোনেরা, বর্তমানে জামানায় মুসলিম কওমের সামনে ইজ্জতের সঙ্গে টিকে থাকার যে সংকট দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে আপনাদের সামনে দু'একটা নজির তুলে ধরতে চাই। এদেশের মুসলমানরা মহাজনের ঋণের বোঝা বইতে বইতে গরু ভেড়া জমিজমা ভিটামাটি থেকে উচ্ছন্নে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে কেন, আপনারা খেয়াল করে দেখেছেন কিছু? আবদুল হামিদ আরও কিছু বলার জন্য একটু দম নিয়েছে, এমন সময় ওস্তাদ জোনাব আলী সাহেবের হাতের স্পর্শ অনুভব করে মাথা তুলে তাকায়। অন্য ছেলে-মেয়েরা বালক আবদুল হামিদের ভাষণ শুনে মুচকি হাসছে। ওস্তাদ বলেন 'বেশ বাবা' আমি শুনে খুব তারিফ করছি তোমার। গতকাল ওয়াজ মাহফিলে মুন্সি মেহেরুল্লাহ সাহেব যে সব কথা বলেছেন, তুমি সেই সব কথা বলতে পারলে, এটা তোমার পক্ষেই সম্ভব। জনাব আলী ওস্তাদ আবদুল হামিদের প্রতি খুব নজর দিতে থাকেন। হামিদকে নিয়ে তিনি পরিকল্পনার জাল বুনতে থাকেন। সিরাজগঞ্জ শহরে জ্ঞানদায়িনী মাইনর স্কুলে শরাফতি ভাব বেজায় বেশি। ওস্তাদজির ছাত্ররা তাকে দেখে বলে ওস্তাদজি সালাম। ওস্তাদজি ভাবেন তাঁর ছাত্র হামিদও একদিন খুব বড় হবে,

তার কদর বাড়বে। লেখাপড়া খেলাধুলায় হামিদ এগিয়ে। পাড়ায় পাড়ায় বল খেলতে যায়। হামিদ ফুটবলের সেরা খেলোয়ার হিসেবে পরিচিত হন এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে পিতলের মেডেল পুরস্কার পান। তার পুরস্কার যেন সোনার চেয়েও দামী। বারো বৎসর বয়সে হামিদের মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে খুব কষ্ট হয়। হামিদ খেতেও পারেনি। অতপর তিনি ভেঙ্গে না পড়ে আরো লেখাপড়ায় বেশি বেশি মন দেয়। কোরআন, উর্দু রাহেনাজাত পড়া শেষ করেন। এমন সময় মুন্সী মেহেরুল্লাহ সাহেব হামিদের অগ্রগতি দেখে খুশি হন এবং হামিদ মুন্সীর তালবে এলেম হয়ে যান। মুন্সী সাহেবের বড় সাগরেদ সোবহান মিয়া হামিদের জন্য চটিজুতা তালের টুপি এনে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন। মুন্সী সাহেব ইসলামী বক্তৃতামালা রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। তার তালেবে এলেমরা সেই বক্তৃতা মুখস্থ করে ওয়াজ শেষ করতো। আবদুল হামিদ জীবনের প্রথম হাজিরানে মজলিশে ওয়াজ করতে দাঁড়ান। মজলিশের উপস্থিত সবাই হামিদের ওয়াজ শুনে মুগ্ধ হয়। পোলাপান মানুষ হলে কি হবে, হামিদের কণ্ঠস্বর বড়ই দরাজ ও মিঠা। মুন্সী সাহেবের অনুরোধে কোনো এক আসরে হামিদ পুঁথি পাঠ করলেন- "মুন্সী মেহেরুল্লাহ নাম/ যশোর মোকাম জাহান ভরিয়া যার আছে খোশনাম। আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার/ হেদায়েতে হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার। মুলুকে মুলুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া/ হিন্দু, খ্রিস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া মুসলমান হইলো সবে কালেমা পড়িয়া"। হামিদের পুঁথি পাঠ শুনিয়া সকলে দিলখোলা তারিফ করলো; হামিদের চোখ মুখ আলোকিত হলো। মাত্র একুশ বৎসর বয়েসে আবদুল হামিদ একজন প্রবীণ আলেমের মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। বোগদাদি পীর নাছির উদ্দীন তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি আবদুল হামিদকে ময়মনসিংহে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। পড়াশুনা শেষ করে আবদুল হামিদ শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে টাঙ্গাইলে চলে আসেন এবং কাগমারীতে অবস্থান নেন। এক বৎসর পর পীর সাহেবের সাথে আসাম চলে যান। তখন সারা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পীর সাহেবের অনুমতিক্রমে দেওবন্দ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক কার্যক্রম চলে। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে আসামের ভাসানচরে ফিরে আসেন। মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ইসলাম প্রচার মিশন স্থাপন করেন। বোগদাদি পীর নাছিরউদ্দীন আরবি-ফারসি, উর্দু ভাষা চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তিনিই তাকে আধ্যাত্মিকপ্রজ্ঞা ও শক্তিধর উত্তরাধিকারি হিসেবে তৈরি করেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম মো. আবদুল হামিদ সাথী সঙ্গীদের চেগা মিয়া জীবনের প্রথম নিজে বাড়ি করেন ভাসানচরে। প্রথম তাকে বলা হতো ভাসানচরের মাওলানা। তারপর ভাসানীর মওলানা বা মওলানা ভাসানী।

সবকিছু ছাপিয়ে দেশবাসী ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হিসেবে সমাদৃত হন ।

ঘটনাক্রমে রাজনীতিকে ছাপিয়ে একসময় প্রকাশ পেলো তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি জীন পরী ডাকতে পারেন। ঝাড়ফুঁকে ওস্তাদ। আসাম পূর্ব বাংলার মানুষের নিকট তিনি পীর ফকির হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। বন্যার্তদের রিলিফ বিতরণের জন্য একবার করোটিয়া আগমন করেন। শত শত মানুষ। তারা যত না রিলিফের জন্য, তার চেয়ে বেশি লোক জমায়েত হয়েছে তার পানিপড়া ও ঝাড়ফুঁক নিতে। লোকে লোকারণ্য। কতজনকে পানি পড়া দিবেন তিনি দরাজগলায় ঘোষণা দিলেন ইন্দারার পানিতে ফুঁ দিবেন। লোকজন ইন্দারার পানি শেষ করে তলানীর কাদা পর্যন্ত নিতে থাকলো। মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাগমারী সম্মেলন। এতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত থেকে বহু রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আব্দুল গাফ্ফার খান (সীমান্তগান্ধী) উল্লেখযোগ্য। কাগমারী সম্মেলন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, গণবিরোধী সামরিক চুক্তি ও পরাষ্ট্রনীতির দাবিতে কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে তিনি শিক্ষা সম্মেলন করেন। জাতীয় কারিকুলামে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কাজে পারদর্শী করার প্রস্তাব দেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দারুল উলুম দেওবন্দে ওস্তাদ কেন্দ্রিক পড়াশুনা করেন। তাঁর প্রধান ওস্তাদ ছিলেন বিপ্লবী আলেম শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান। যিনি তাকে মহান চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির গ্রন্থাবলী পড়ান। তা থেকে তিনি বিপ্লবী চেতনা আহরণ করেন। এই সূত্রই মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী, আধিপত্যবাদ বিরোধী হয়ে ওঠেন। অধিকার আদায়ের প্রতিবাদ সভায় 'খামোশ' হুশিয়ারি বজ্র- বিদ্যুতের মতো সভার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রবাহিত হতো। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ মে গঙ্গা নদীর উপর ভারতের বাঁধ তৈরির প্রতিবাদে বিশাল জনতা সঙ্গে নিয়ে লংমার্চ করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনে এই লংমার্চ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো। বাংলার মুকুটহীন সম্রাট, ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকা-এশিয়ার অবিসংবাদিত মজলুম জননেতা,অসহায় হামিদ খান ভাসানীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে। তিনি বিভিন্ন সময় কারাবরণ করেন। কর্মজীবনে রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তিনি সন্তোষকে উজ্জীবিত করেছেন। জীবন ও মান উন্নয়নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গন স্মৃতি হয়ে আছে। বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত গণমানুষের নেতা,বাংলা ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে এই নেতার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। মহাকালের একজন শ্রেষ্ঠ

বাঙালি মাওলানা ভাসানী। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ হয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। সন্তোষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বপ্ন ও সাধের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

* লেখক : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, লেখক ও ভাসানী গবেষক ।

মাওলানা ভাসানী হক্কুল এবাদ মিশন: ভুলে যাওয়া মহীপুর প্রান্তর

এম.এ. আজাদ সোবহানী আল ভাসানী

আখ ক্ষেতের মাঝ দিয়ে সর্পিল পথ বয়ে চলেছে মহীপুরের প্রান্তরে। কাটা ধান পড়ে আছে ক্ষেত থেকে ক্ষেতে। কোথাও কোথাও মাঠ ভরে গেছে হলুদ সর্ষে ফুলে। সেই মাঠের ভেতর দিয়ে চটি পায়ে এগিয়ে চলছেন একজন মহান নেতা। নাম তাঁর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পেছনে কৃষক ভক্ত-অনুরাগী সংবাদিকগণ হেঁটে চলছেন।

মওলানা ভাসানী, পুরাতন জরাজীর্ণ যা কিছু সামনে পান ভাঙেন । সেই ভাঙনের ওপর নতুনের বীজ বপন করেন। তিনি বলেন, 'গড়িতে হইলে ভাঙিতে হয়।' তাঁর জীবনটাই ছিল ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের এক অপূর্ব সমন্বয়। তিনি একদিকে যেমন শোষণ, বঞ্চনা, অসাম্য, ভেদাভেদের শৃঙ্খল ভাঙার কথা বলেন; অন্যদিকে মানুষের জন্য সাম্যভিত্তিক নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন এবং দেখান । এখানে তাঁকে আমরা ইংরেজ কবি শেলীর সাথে তুলনা করতে পারি । যিনি একই সঙ্গে ধ্বংস এবং সৃষ্টির কবি ছিলেন ।

মওলানা ভাসানী তাঁর সমাজ বদলের চিন্তা ও দর্শন, চর্চা ও চেতনা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য জীবনের শুরু থেকেই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে আমরা তাঁর

প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই। আসাম জীবনেও তিনি নানান ধরনের শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেখানে। এরকম আরেকটি অধ্যায় তাঁর রয়ে গেছে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার মহীপুরের প্রান্তরে। মওলানা ভাসানীর মহীপুরের অধ্যায়টি অনালোকিত বিধায় আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাণ প্রদীপের আলোয় খুব একটা আসেনি।

মওলানা ভাসানী ১৯২৫ সালে পাঁচবিবির মহীপুর বীরনগরের জমিদার ছামিরউদ্দিন তালুকদারের কন্যা আলেমা খাতুন ভাসানীকে বিয়ে করেন। ছামিরউদ্দিন তালুকদারের সাথে মওলানা ভাসানীর সখ্য হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সূত্র ধরে। এক পর্যায়ে তিনি এই ছামিরউদ্দিন তালুকদারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং স্থানীয় অত্যাচারী জমিদারদের সাথে বিরোধে প্রজাহিতৈষী ছামিরউদ্দিন তালুকদারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন । এরপর তিনি এ বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীকালে ছামিরউদ্দিন তালুকদারের একান্ত বিশ্বাসভাজনে পরিণত হন। ছামিরউদ্দিন তালুকদার তাকে নিয়ে হজব্রত পালন করেন এবং পরবর্তীতে তার মেয়ে আলেমা খাতুন ভাসানীকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন।

আলেমা খাতুন ভাসানী ছিলেন মহীপুর বীরনগরের জমিদার ছামিরউদ্দীন তালুকদারের একমাত্র মেয়ে। বাবার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন অঢেল সম্পদ। যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৬০ একর জমি। এসবই তিনি সমর্পণ করেছিলেন মওলানা ভাসানী সমীপে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ নির্মাণে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কিয়দংশ আজো সেখানে বিদ্যমান।

১৯৬৪ সালে মওলানা ভাসানী তাঁর সমাজ বদলের আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহীপুরে গড়ে তোলেন 'হক্কুল এবাদ মিশন'। এই মিশনের আওতায় তিনি এখানে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি এখানে 'হাজী মহসিন ও আল্লামা ইকবাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতাত্তোর যা বর্তমানে 'মহীপুর হাজী মহসীন সরকারি কলেজ' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এখানে মহীপুর মওলানা ভাসানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মহীপুর মওলানা ভাসানী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সন্তোষ, আসামের মতো এখানেও মওলানা ভাসানীর আদর্শ, উদ্দেশ্য, শিক্ষাদর্শন, কারিকুলাম অবহেলিতই রয়ে গেছে।

মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেই পাঁচবিবির মহীপুরে 'হক্কুল এবাদ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি

এখানে নতুন এক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ভাবনার প্রবল প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মিশনে নতুন সমাজ দর্শনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ৬০ একর জমির ওপর পরিকল্পিত এই বিরাট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মিশনের চারদিক তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন। এই মিশনের ছাত্রদের জন্য তিনি হোস্টেল, ফজলুল হক হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাজী মহসিন ও আল্লামা ইকবাল কলেজে সে সময় পড়াশোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রায় তিন শত ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে তিনি কলেজের আর্টস ও কমার্স বিভাগের শিক্ষা শুরু করেছিলেন। তখন কলেজে ৯ জন শিক্ষক অধ্যাপনার দায়িত্বে ছিলেন। মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'এখানে গড়ে উঠেছে আমার স্বপ্ন। আমি বেঁচে থাকতে এর বাস্তব রূপ দেখে যাবো আমার আকাঙ্ক্ষা।'

ইতোমধ্যেই কয়েকটি দালান ওঠে গেছে তখন মহীপুর প্রান্তরে । শিক্ষার্থীদের আবাসের দালান, হাসপাতাল, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র, সংস্কৃতি ভবন ইত্যাদি। নতুন বোনা শাল গাছ। পথের দু'ধারে সারি সারি তুত গাছ। পাশের পুকুর থেকে বালতি করে পানি নিয়ে এসে তিনি নিজ হাতে পানি ঢালেন প্রতিটি গাছের গোড়ায়। জৈব সার দেন, যত্নাত্তি করেন। তিনি বলেন, 'এগুলো আমি এনেছিলাম চীন দেশ থেকে। এগুলো দিয়ে ভাল গুটিপোকার চাষ হবে। তা থেকে সিল্ক তৈরি হবে। সেরিকালচার শেখানো হবে এখানে। ছাত্ররা সবকিছু শিখবে এই মিশনে।'

মওলানা ভাসানী নিজেই সাংবাদিক, কর্মীদের বুঝিয়ে দেন কোথায় বয়ন শিল্পের কাজ হবে, কোথায় মিশনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে। যেখান থেকে নতুন সংস্কৃতির জোয়ারে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পীরা রচনা করবেন নাটক, গান, সাহিত্য। প্রাচীন এই জনপদ হয়ে উঠবে মেহনতি মানুষের অনুপ্রেরণার উৎসভূমি। এমন আদর্শ স্থান আর কোথায় পাওয়া যাবে? বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান তিনি। তারপর পিছন ফিরে তাকিয়ে বলেন, 'আমি সর্বহারাদের কথা বুঝি ভাল। শহুরে মিডিল ক্লাসের লোকদের বাপু আমি বুঝি কম।'

মওলানা ভাসানী মহীপুর মিশনের নাম দিয়েছিলেন 'হক্কুল এবাদ মিশন'। তিনি বলতেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মিশন। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মতো একটা কিছু গড়ে তোলার ইচ্ছে থেকেই তাঁর এই মহীপুর মিশন। সাধারণ মানুষকে গভীর মমতা দিয়ে ভালোবাসার যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন; মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপ দিতেই তিনি এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী আলেমা খাতুন ভাসানীর সমস্ত জমি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের সাহায্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই মিশন। মিশনের কাজে তিনি পুঁজিপতি শিল্পপতিদের কাছ থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ

করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন । সাধারণ কৃষক শ্রমিক ছাত্ররা তাদের শক্তি সামর্থ্য দিয়েই মিশন গড়ে তোলার কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন। একটি জিনিস তিনি মিশনের এবং সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও করেছেন; কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নাম সংযোগ করে দেননি। তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণ হয়েছে দেশ-বিদেশের বরেণ্য নেতৃবৃন্দের নামে।

আবার তিনি চলেন ধান ক্ষেতের দিকে। একটা টিনসেড ঘরের কাছে কয়েক হর্সপাওয়ারের ভারি একটা ডিজেল ইঞ্জিন পড়ে আছে। সঙ্গে কাপলিং করা ওয়াটার পাম্প। চীন থেকে মওলানা ভাসানী উপহার পেয়েছিলেন। ইঞ্জিনটা আনা হয়েছিল মহীপুর প্রান্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা সেচন করার জন্য। এখন আর ইঞ্জিনটা দিয়ে কাজই হচ্ছে না । মওলানা দুঃখ করে বলতে থাকেন, 'আমাদের পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার এসে নতুন খাল কেটে দিয়ে গেল জমির ধার দিয়ে। কিন্তু খালে পানি আসেনি কখনও। পাশেই তুলসীগঙ্গা। ঠিক নদী নয়। দিনাজপুরের আসুরাইল বিল থেকে পানি আসে তুলসীতে কিন্তু শীতের সময় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মাঝখানে গাঁয়ের ছেলেরা ডাংগুলি খেলে তখন। কথা ছিল তুলসীগঙ্গা থেকে পানি নতুন কাটা ক্যানাল দিয়ে প্রবাহিত করা হবে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের বাহাদুরি বটে। ক্যানালের ঢালটা হল ঠিক উল্টো দিকে। কত টাকা নষ্ট হল অযথা।' বলতে বলতে সবাইকে নিয়ে আমতলায় সাজানো বেঞ্চিতে বিশ্রামের জন্য বসতেই গ্রামবাসী তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে হাজির হয় তাঁর কাছে। তিনি গভীর দরদ দিয়ে তাদের কথা শুনেন । সাধ্যমত সমাধানও দেন। কাউকে পরামর্শ দিয়ে, কাউকে পানি পড়া- দোয়া দরুদ দিয়ে, আবার কাউকে চিকিৎসা বা সন্তানের পড়াশুনার জন্য টাকা পয়সা দিয়ে। সবাই তাঁকে কদমবুচি করে খুশি মনে বিদায় নেয়। মওলানা ভাসানী ১৯৬৯ সালে মহীপুরে কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে সমিতির নেতাদের এক জরুরি সভা ডাকেন। এই সভায় আলোচনার একপর্যায়ে হঠাৎ তিনি প্রস্তাব করেন, অক্টোবর মাসে পাকসীর শাহপুরে কৃষক সম্মেলন করতে হবে। সারা দেশ থেকে লাঙল মার্কা লালটুপি পরে লংমার্চ করে ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হবে। একই সালের ২৮ আগস্ট মহীপুরে কৃষক কর্মী সম্মেলনের ভাষণে তিনি বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য বডি ওয়ারেন্ট, কৃষকের গরু, তৈজসপত্র, চাষের সরঞ্জাম ক্রোকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এই সম্মেলনেই তিনি ৪ অক্টোবর শাহপুরে 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির' স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সম্মেলনের কথা ঘোষণা করেন। এরপর গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মওলানা ভাসানীর মিশনের কাজে কিছুটা ছেদ পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তাঁর সেই স্বপ্ন অনেকটাই মুখ থুবড়ে পড়ে। চেনা সেই মহীপুরের প্রান্তর আজ বড্ড অচেনা সুরে ভারাক্রান্ত বটে! ফজলে লোহানীর

সুরে বলতে গেলে– 'তাঁর চোখে কোন গাঁয়ের সেই নিভৃত সন্ধ্যার ছবি। নিকোনো উঠোনে ধানের সুবাস। আমগাছে বাঁধা হালের গরু। বৃদ্ধাদের কণ্ঠে মন ভোলানো ছড়া। কিন্তু স্নিগ্ধ মন্থর সন্ধ্যার গাঁয়ের দুকূলভরা প্রশান্তির এই ছবি খানখান হয়ে ভেঙে গেল একদিন।'

[তথ্যসূত্র: মহীপুরের প্রান্তর, ফজলে লোহানী; শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী, খন্দকার আবদুর রহিম; সৈয়দ ইরফানুল বারী। লেখক: সেকশন অফিসার, বিজ্ঞান অনুষদ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ।

মাওলানা ভাসানীর রূহানী রাজনীতি

অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন

'মা রামাইতা ইজ রামাইতা গোপ্ত হক
কারে হক বর কারহা দারাদ সবক'
-রুমীর মসনবী

অর্থাৎ 'তুমি যখন তীর ছুড়েছিলে তখন তা' তুমি ছুড়নি, আল্লাহই ছুড়েছিলেন'– এ কথাগুলো নবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে সুরা আনফাল, আয়াত-১৭-তে আল্লাহ্ বলেছেন। রূহানী শক্তির অধিকারী যাঁরা তাঁরা স্বীয় নফসের সাথে জেহাদ করে জয়ী হয়ে আল্লাহর ইচ্ছাতে বিলীন হয়ে যান। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে তারই বিধানকে কায়েম রাখেন স্বীয় জীবনে। এঁদেরই আল্লাহর ওলি বলা হয়। কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাঁর ওলিদের পক্ষ হয়ে কাজ করে থাকেন। হাদিসে কুদসীতে আছে, 'আল্লাহ বলেন– এক পর্যায়ে আমার দোস্তের (ওলির) হাত আমার হাত হয়ে যায়। তার চোখ আমার চোখ হয়ে যায়। আমার বন্ধুর জবান আমার জবান হয়ে যায়। আমার দোস্তের হাত দিয়ে যা করা হয় আমিই করি। আমি তার চোখ দিয়ে দেখি। সে যে জবানে কথা বলে সে কথা আমিই বলি।'

এসব ওলিগণের মধ্যে কেউ জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে এমন স্তরে উন্নীত হন যে, তাঁরা আল্লাহতায়ালার ঐশী ক্ষমতার বলে যেমনি হয়ে যান দেশ-জাতি-

সমাজ ও আপামর জনগণের অবিসংবাদিত নেতা তেমনি আবার অলি-আউলিয়াগণেরও নেতা হয়ে যান, হয়ে যান কুতুবে এরশাদ। তখন এদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি সব কিছু স্রষ্টা নির্ভরশীল হয়ে মানবকল্যাণে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করেও অনন্য অসাধারণ থাকেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (রহ.) হুজুর ছিলেন তেমনই এক অসাধারণ মহান ব্যক্তি যিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপক্বতা অর্জন করে বৈষয়িক জগতে আপামর জনগণের যেমনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চমার্গে আহরণ পূর্বক অলি-আউলিয়াগণেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এজন্যই তাঁকে বলা হতো– সুফী নেতা মওলানা ভাসানী কুতুবে এরশাদ।

রাজনীতিবিদগণ রাজনীতি করেন নিজ নিজ পার্টি বা দলের উপর নির্ভরশীল থেকে। তারা সদা সর্বদা জনগণের উপর নির্ভরশীলতার কথা বলে থাকেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মমদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটা বাস্তব সত্য। এঁরা তাদের স্ব স্ব দলের প্রধান ও উদীয়মান নেতা-কর্মীদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত ও দলীয় কর্মসূচি দিতে বাধ্য থাকতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। এঁরা থাকেন নিজ নিজ দল ও জনগণের মুখাপেক্ষী।

কিন্তু পার্টি জনগণের মুখাপেক্ষী না হয়েও কিছু কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি দেশ, জাতি, সমাজ ও জনগণের জন্য রাজনীতি করে গেছেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যেক দেশেই কোনো না কোনো ব্যক্তিকে দেশ, জাতি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য স্রষ্টা একটা মডেল বা আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র জাতির মডেল বা আদর্শ হচ্ছেন হযরত মোহাম্মদ (সা.)। পরবর্তীতে তাঁরই আদর্শের ধারক বাহক হয়েছেন আহুলুল বাইত ও অলি-আউলিয়াগণ। রাজনীতিবিদগণের কেউ কেউ অলি-আউলিয়াগণের নির্দেশনায় কাজ করে মানব কল্যাণে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। ভারতে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মহাত্মা গান্ধী, মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ, ফিলিস্তিনে ইয়াসির আরাফাত, ইরানে ইমাম খোমেনী (রহ.) এবং বাংলাদেশে এঁদের মধ্যে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (রহ.) হুজুর ছিলেন অন্যতম। মাওলানা ভাসানী হুজুর (রহ.) ছিলেন রূহানী রাজনীতির অনুসারী। 'রূহ' অদৃশ্যভাবে আমাদের মাঝে অবস্থান করে। রূহের সাথে সম্পর্ক হলে মানুষ 'পরমাত্মার' সন্ধান পায়। পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা-উপলব্ধি করতে পারলে মানব জীবন সার্থক হয়। মনুষ্য জীবন তখন হয়

মহামূল্যবান ও মহিমাময়। ধর্ম, সত্য, ন্যায় স্রষ্টার বিধানের নৈতিকতা হয় তখন তাঁর ভূষণ। পরমাত্মা স্রষ্টাভিমুখী ও স্রষ্টার ইচ্ছায় বিলীন। তাঁর কাজকর্মও স্রষ্টার ইচ্ছাধীন থাকে। 'আল্লাহুস সামাদ' নামের গুণাবলীর তিনি অধিকারী হন। স্রষ্টা বা আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তিনি থাকেন সকল প্রকার অভাবের উর্ধ্বে।

তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকল সৃষ্টি জগতের প্রাণী, বস্তু, সামগ্রিক বিষয় আসয় থাকে মহান আল্লাহতায়ালার মুখাপেক্ষী।

তিনি কোনো কিছু প্রাপ্তির আশায় নয় নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরম স্নেহ দিয়ে দয়া ও মমত্ব দিয়ে লালন-পালন ও বিকশিত করেন। এ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাঁর ইবাদত কবুল করেন। তাঁর নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জেহাদ– এগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয় না, ফলপ্রসূ হয়।

মওলানা ভাসানী হুজুর (রহ.) ছিলেন 'আল্লাহুস সামাদ' নামের গুণে গুণান্বিত। এ জন্য তিনি কোনো রাজনীতিবিদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, রাজনীতিবিদরাই তাঁর মুখাপেক্ষী ছিলেন, জনগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন না– জনগণই ছিল তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত মুখাপেক্ষী। তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহ, আন্তরিক ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সহানুভূতি দরদী মনমানসিকতার কাছে সকল শ্রেণির সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো বন্দী। কী হিন্দু, কী মুসলিম, কী খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ, জেলে-মাঝি, তাঁতী, মুচি, মেথর, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি ছোট বড় বলে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করতেন না– তিনি সবাইকে এক আল্লাহর সৃষ্টি বলে একইভাবে ভালোবাসতেন। এ কারণে তিনি থাকতেন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত স্বর্গীয় সত্য সুন্দর অনুভূতিতে উদ্ভাসিত। এজন্য তিনি নয়, জনগণই স্বভাবগতভাবেই তাঁর মুখাপেক্ষী থাকতো এবং তাঁর নির্দেশনায় মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতো। আর তিনি মনে করতেন, যাদের থাকার ঘর নেই, পরনের কাপড় নেই, পেটের ভাত নেই, রোগের চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, যারা ফুটপাতে, রেল লাইনের ধারে, নদী ভাঙা তীরে, খোলা আকাশের নিচে, গাছের তলায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, আনাচে-কানাচে ঝুপড়ি বেঁধে অমানবিক জীবন-যাপন করছে তাদের জীবনের সুখ শান্তি এবং সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরত হলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজসাধ্য হয়। এ জন্যই প্রিয় নবীর (সা.) প্রিয় সাহাবা হযরত আবুজর গিফারী (রা.) গরীব-মেহনতি মানুষদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মাওলানা ভাসানী হুজুর আল্লাহ পাকের ইবাদতের পাশাপাশি দেশের কৃষক, ছাত্র-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী ও গরীব মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য

আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। এর বিনিময়ে তিনি তাদের কাছে কোনোদিন কোনো কিছু চাননি। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআন পাকে এমন ওলিদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ‘ তোমরা অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না’ (সুরা ইয়াসিন: আয়াত-২১)। মওলানা ভাসানী হুজুর নিজ আরাম আয়াসের জন্য জনগণের নিকট কোনো কিছু চাওয়া তো দূরের কথা নিজে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কারো কাছে ভোটও চাননি কোনোদিন। জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শাসকদের বিরাগভাজন হয়ে জীবনের তেত্রিশটি বছর তিনি জেল-জুলুম ভোগ করেছেন নিঃসঙ্কোচচিত্তে।

জনগণ বুঝতে পেরেছিলেন মওলানা ভাসানী (রহ.) হুজুরই তাদের প্রকৃত আপনজন– একমাত্র বন্ধু। অন্যেরা সবাই রাজনীতি করেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, তাদের কাছে সময়ে সময়ে আসেন ভোট পাওয়ার প্রত্যাশায়। জনগণ এটা ভালোভাবে বুঝে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তারা শত বিরোধিতার মুখেও মওলানা ভাসানী (রহ.) হুজুরের মুখাপেক্ষী থাকতো; তাঁর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্তরিক সাড়া দিতো। কৃষক, মজুর, ছাত্র-জনতার স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী হুজুর (রহ.) এজন্যই বলতেন– ‘ ভোটের আগে ভাত চাই।’ দেশ আজ ক্রান্তিলগ্নে। জাতি ও সমাজ আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রাজনীতিবিদদের অপরিপক্ব সিদ্ধান্তে দেশ আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত। যারাই ভোটের কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশ দুর্নীতিবাজ এবং জনগণকে ব্যবহার করে এইসব লোভাতুর স্বার্থপর রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে। আর অজ্ঞ জনগণ ও স্বার্থপর লোভাতুর বুদ্ধিজীবী, কতিপয় শিক্ষক, কবি-সাহিত্যক, মওলানা, মৌলভী, ধর্মীয় নেতা, লেখক, সাংবাদিক রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের নিজ নিজ অভিলাষকে হাছিলের জন্য এসব ক্ষমতালোভী প্রবীণ ও নবীন রাজনীতিবিদদের অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

দুর্নীতির মামলা থেকে যারাই ছাড়া পাচ্ছে তারাই নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করে পুর্ণোদ্দমে দুর্নীতিতে রত হবেন না– এমন প্রতিশ্রুতি কে দিতে পারেন? বলা যায় দেশ নিঃসন্দেহে ভয়াবহ পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রথম দিকে যেভাবে এগুচ্ছিলেন এতে সাধারণ জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছিলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই উদ্বিগ্ন। ব্যাংক ও শেয়ারবাজার লুণ্ঠনকারী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তারা যথার্থ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারণে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি গরীব মেহনতী মানুষ ও মধ্যবিত্তদের জীবনকে করেছে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এখন সমাজে সৎ লোকের

নেতৃত্ব প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। আর মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (রহ.) হুজুরের মতো নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী খাঁটি দেশপ্রেমিক, রূহানী শক্তিসম্পন্ন আল্লাহ ভীরু জনদরদী নেতার বড় প্রয়োজন, যার অঙ্গুলী হেলনে ও খামোশ বলার সাথে সাথে দুর্নীতিবাজ, দেশি-বিদেশি ফেরআউন, নমরুদ-এর তখত-তাউশ খানখান হয়ে ভেঙে যায়, অন্যায় অত্যাচার নির্মূল হয়, সমাজ থেকে শোষণ বঞ্চনা সন্ত্রাস চিরতরে দূর হয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিরকালের জন্য ভূলুণ্ঠিত হয়।

রানী-মৌমাছিকে অন্যান্য অসংখ্য মৌমাছিরা যেমন ঘিরে থাকে এবং সদাসর্বদা মধু তৈরি করতে ব্যতিব্যস্ত থাকে তেমনি রূহানী তাকতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মওলানা ভাসানী হুজুরকে সদা-সর্বদা ঘিরে থাকতো ভালো-মন্দ সব ধরনের জনগণ। মওলানা ভাসানী হুজুর ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সব ধরনের লোকের দ্বারাই যতটুকু পারা যায় দেশ-জাতি, সমাজ ও দুস্থ মানবতার কল্যাণে কাজ করিয়ে নিতেন। মওলানা ভাসানী হুজরের সাহচর্যে থেকে দুর্নীতিবাজ, খারাপ লোক অধিকাংশই ভালো হয়ে যেতো। মওলানা ভাসানী হুজুরের আধ্যাত্মিক ভক্ত মুরিদদের মধ্যে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে: ‘আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতায় মওলানা ভাসানী হুজুর (রহ.) শয়তানকে দিয়েও দেশ ও সমাজের জন্য ভালো কাজ করাতে সক্ষম ছিলেন।’ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাস্তব একটি ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে: ব্রিটিশ শাসন আমলের প্রতাপশালী ডাকাত সর্দার যিনি ডাকাত সম্রাট বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ধলেশ্বরী, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র অধ্যুষিত চরাঞ্চল যার দখলে ছিল এবং যিনি এসব এলাকার জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা দিতে বিরত রেখেছিলেন সেই ডাকাত সর্দার সম্রাট কচিম উদ্দিন দেওয়ান মওলানা ভাসানী হুজুরের সাহচর্যে এসে ডাকাতি ছেড়ে পরিশেষে শোষণ, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে গরীব দুঃখীদের পক্ষে সংগ্রাম করে জীবন উৎসর্গ করে গেলেন। এটা কি পরীক্ষিত বাস্তব সত্য নয়? পরশপাথরতুল্য মওলানা ভাসানী হুজুরের (রহ.) সাহচর্যে এসে অমানুষও মানুষ হয়ে গেছে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক রয়েছে।

অনেক বাস্তববাদী তর্কবাগীশ রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবী বলতে পারেন, দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-নেত্রীদের আহ্বানেও লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দেন, তাদেরকেও দলের হাজার হাজার কর্মীরা সদা সর্বদা ঘিরে রাখে।

এসকল ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে মাশায়েখ সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর সাথে পৃথ্বিরাজের যাদুকর অজয় পালের কথিত একটি কাহিনি তুলে ধরা যেতে পারে। বোধশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। যাদুকর অজয়পাল খাজা বাবা (রহ.) কে লক্ষ্য করে বলল: ‘আপনার মতো আমারও অনেক অনুসারী আছে। আমি ও আপনি প্রায় সমানে

সমান। তাই আপনার সাথে আমার একটা সমঝোতা হতে পারে না কি?' খাজা বাবা (রহ.) উত্তরে বললেন– তোমার যা কিছু সবই শয়তানের কারসাজি। আর আমার সবকিছুই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (রা.)। তোমার ভিত্তি মিথ্যা ও নফসানিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত– আমার ভিত্তি সত্য ও আল্লাহর বিধান রবুবিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পার্থক্য আসমান আর জমিন সমতুল্য। যাদুকর খাজা বাবা (রহ.)-এর পাশে অবস্থিত একটি চৌবাচ্চায় সংরক্ষিত পানির দিকে ইঙ্গিত করে বললো–

আমি এই চৌবাচ্চায় নেমে পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারি। খাজা বাবা (রহ.) বললেন: হয়ে যাও। যাদুকর অনুমতি পেয়ে তৎক্ষণাৎ চৌবাচ্চার পানিতে নেমে পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে উঠে আসলো। খাজা বাবা (রহ.) লোকজনদের বললেন: তোমরা পানির ঘ্রাণ নিয়ে দেখ এর গন্ধ কি রকম? লোকেরা চৌবাচ্চার নিকট গিয়ে নাকে রুমাল এঁটে ফিরে এসে বললেন– সাপের গায়ের পচা গন্ধ! কি ভয়ানক বিশ্রী! দম যেন বের হয়ে আসতে চায়!

এবার খাজা বাবা (রহ.) অপর একটি চৌবাচ্চার পানিতে নেমে তিনিও পানির সাথে একাকার হয়ে মিশে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে ওঠে আসলেন এবং লোকজন বললেন: এবার তোমরা এ চৌবাচ্চার পানির ঘ্রাণ নিয়ে দেখো, কি রকম? লোকেরা খাজা বাবা (রহ.)-এর চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে পানিতে মেশক জাফরান যুক্ত আতরের বেহেশতী খুশবু অনুভব করলো। তারা যে যেমন পারলো রুমাল বা কাপড় ভিজিয়ে খুশবু নিতে লাগলো। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেলো যে, চৌবাচ্চায় আর পানিই রইলো না। লোকেরা চৌবাচ্চা মুছে মুছে নূহ (আ.) এর নৌকার মতো ঝকঝকে করে ফেললো। অজয় পাল খাজা বাবার (রহ.) পদপ্রান্তে পড়ে যান। হয়ে যান তাঁর ভক্ত অনুসারী। খাজা বাবা (রহ.) তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ বিয়াবানী।

ওলি আওলিয়া ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদদের রাজনীতি একই রূপ মনে হলেও আসলে তা এক নয়। ব্যবধান থাকে অনেক, হয় ব্যতিক্রমধর্মী। দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক নেতা নেত্রীগণ রাজনীতিকে শয়তানী নফসানিয়াতের উপর দাঁড় করিয়ে যাদুকর অজয় পালের দুর্গন্ধময় পচা-গলিত সাপের মতো করে তুলেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের পদলেহী হয়ে দেশ, জাতি, সমাজকে অনিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ নয়, ব্যক্তি স্বার্থ ও স্বজন স্বার্থই এদের কাছে বড় কথা। আন্তর্জাতিক ইহুদী বর্ণবাদ এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের হাতের পুতুল হিসেবে এরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের হাতে এখন আর রাজনৈতিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও মনে হচ্ছে নেই। নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী হয়ে এদের কেউ-ই এখন আর সাংসদ ও মন্ত্রী হতে চান না। সাংসদ মন্ত্রী

হয়ে সর্বোচ্চ বেতন–ভাতা সম্মানীসহ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার লক্ষ্যেই এরা রাজনীতি করেন। এখন এমন কি কেউ আছেন যিনি এসব সুযোগ ভোগ না করেও নিঃস্বার্থ ত্যাগী সাংসদ ও মন্ত্রী হতে চান? স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ দুর্নীতি এদের অন্তরাত্মাকে গ্রাস করে ফেলেছে। এদের অধিকাংশের আচার-আচরণ কথাবার্তা বাহ্যিক কার্যক্রম মার্জিত ও গণমুখী কিন্তু আন্তরাত্মা কলুষিত। এরা খারাপ লোকদের আরও খারাপ করে। এরা ভালো লোকদের তাদের দলের দিকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের স্বার্থ হাছিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

আল্লাহর দরবারে শুধু বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম ও আনুষ্ঠানিকতা পৌঁছায় না এর সাথে আন্তরিক বিশ্বাস বা আকিদা প্রচেষ্টা ও নিষ্কলুষ সরল মন-মানসিকতারও প্রয়োজন। এটা সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণির মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি আমরা যে অফিস আদালতে কিংবা ঘরে-বাইরে যেখানেই আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি না কেন সর্বক্ষেত্রেই এটার প্রতিফলন অনিবার্য। পবিত্র কুরআন পাকে বলা হয়েছে 'কুরবানীকৃত পশুর রক্ত ও মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, পৌঁছায় তোমাদের অন্তরের বিশ্বাস বা তাকওয়া' (সুরা-হজ, আয়াত-৩৭)। 'বিহারুল আনওয়ার' খণ্ড ৪৭ পৃ. ৭৯ খণ্ড ৬৮ পৃ. ১১৮তে একটি কাহিনির বর্ণনা রয়েছে, বোধশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী লোকদের জন্য এতেও নিদর্শন রয়েছে: 'আবুবাসীর বর্ণনা করেন, আমি ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর সাথে হজ করতে গিয়েছিলাম। তওয়াফ করার সময় ইমাম (আ.) প্রশ্ন করলাম, ' হে মহান ইমাম (আ.) আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, এই অসংখ্যলোক যারা হজে অংশগ্রহণ করেছে, আল্লাহপাক তাদের সকলকে কি ক্ষমা করবেন?' ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বললেন, হে-আবু বাসীর! এ জনসংখ্যার মধ্যে অনেকেই বানর ও শূকর।'

আমি বললাম, 'তাদেরকে আমাকে দেখিয়ে দিন।' ইমাম জাফর সাদিক (আ.) আমার চোখে হাত দিয়ে কিছু পড়লেন। আমি ঐ জনগণের মধ্যে অনেককেই দেখলাম যারা বানর ও শূকর এবং ঘাবড়ে গেলাম। ইমাম জাফর সাদিক (আ.) পুনরায় আমার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন আমি আবার তাদের বাহ্যিক রূপ দেখলাম। অতঃপর ইমাম (আ.) বললেন, ' হে আবু বাসীর! তুমি চিন্তিত হয়ো না, তুমি বেহেস্তে সুখে থাকবে এবং জাহান্নাম তোমার স্থান নয়। আল্লাহর শপথ! আমাদের প্রকৃত অনুসারীরা কেউই দোজখে যাবে না।

এতে প্রমাণিত হয় রাজনীতি হোক, ধর্মনীতি হোক, সমাজনীতি হোক যে কোনো কর্মই হোক না কেন তা হতে হবে স্রষ্টা নির্ধারিত পথে। অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ শয়তানী নফসানী শক্তির অনুসারী, এরা ইসলামের সবচেয়ে গর্হিত কাজ পরনিন্দা বা পরচর্চায়রত অথচ নিজেদের দোষ-ত্রুটি

সম্পর্কে উদাসীন, এদের অধিকাংশেরই অন্তরাত্মা মিথ্যা, অন্যায়, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, দাম্ভিকতা ও রিয়া প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তির কামনার বাস্তবায়নের প্রবল বাসনা। অতএব মওলানা ভাসানী হুজুরের পুত-পবিত্র রাজনীতির সাথে এদের রাজনীতির তুলনা করা যায় না। মওলানার রূহানী রাজনীতিতে সুঘ্রাণ বেহেশতী অনুভূতি বিদ্যমান। তাঁর রাজনীতি স্রষ্টার পালনবাদের অত্যোজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় আলোকিত। এখানে নফসানিয়াত বিদুরিত। আল্লাহতায়ালার পালনবাদ বা রবুবিয়াতের নীতিতে এটা উদ্ভাসিত এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে এটা আবির্ভূত। পক্ষান্তরে দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা রাজনীতিকে অজয় পালের দুর্গন্ধময় গলিত পচা লাশের মতো করে তুলেছে। এসব রাজনীতিবিদদের সৎ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মনে মনে ঘৃণা করে এবং ঘৃণিত এসব রাজনীতিবিদদেরকে কৌশলে উপেক্ষা করে থাকে। ভোট দেয় অজ্ঞতা অথবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ভয়ে। আদর্শগত কোনো কারণে নয়, দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতা হাসিলের জন্যই এরা রাজনীতি করেন।

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের কর্মকাণ্ডেই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন রয়েছে, সঠিক দিক-নির্দেশনায় সত্য সুন্দর ন্যায়ের উপর তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সঠিক দিক-নির্দেশনায় সত্য ও সুন্দর ও ন্যায়ের উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হলে তা আল্লাহতায়ালার দরবারে কবুল হবে না এবং এটা পশুর কর্ম বলে প্রতীয়মান হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের শিরোমণি সুফী নেতা মওলানা ভাসানী হুজর (রহ.) এটা মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর সারাটা জীবন রবুবিয়াতের বিধান অনুযায়ী কাটিয়েছেন এবং তাঁর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র ও জনকল্যাণে উৎসর্গ করে গেছেন।

মওলানা ভাসানী (রহ.) হুজুরের রুহানী রাজনীতি এদেশের জনগণের জন্য কল্যাণকর একটি উজ্জ্বল শাশ্বত সত্য সুন্দর আদর্শ বা মডেল। স্রষ্টা প্রদত্ত এ আদর্শকে যতদিন পর্যন্ত এদেশের রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, শিল্পী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, পেশাজীবী, ব্যবসায়ীগণ, স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবে না ততদিন পর্যন্ত দেশ-জাতি-সমাজে একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান থাকবে। কারণ মওলানা ভাসানী (রহ.) হুজুরের আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ। মহানবী (সা.)-এর আদর্শের জ্বলন্ত উজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হুজুর (রহ.)। তাই আসুন! দেশ, জাতি ও সমাজকে বাঁচাতে আজকের এই দুর্দিনে তাঁর আদর্শের রূহানী রাজনীতিকে সুস্থ মানসিকতায় আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করি।

[নিবন্ধটি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২২ আগস্ট ২০০৮ খ্রি. শুক্রবার প্রকাশিত হয়।]

সন্তোষকে নিয়ে মাওলানা ভাসানী হুজুরের স্বপ্ন

অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রহমান

আমাদের এই বাংলাদেশ কিন্তু এমন ছিলো না, ছিলো আরও বড়। আরও সম্পদশালী। আজকের ভারতের পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ছিলো তখন আমাদের। আমাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছের গল্প তখন এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপের দেশে দেশে।

আমাদের মসলিনের তখন কত কদর আর সুনাম। মসলিন ছিলো খুব উচুমানের মিহি কাপড়, যা বাংলাদেশের তাঁতিরা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারতো না।

বাংলাদেশের সম্পদ ও সুনামের লোভে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসতো ভ্রমণকারী। দলে দলে আসতো ব্যবসায়ীরা। এখন যেমন শীতের পাখিরা আসে, অনেকটা সে রকম। এই ব্যবসায়ী বাংলাদেশের নদী নিসর্গ আর ধনদৌলত দেখে অবাক হতো। কেউ কেউ এ দেশের জিনিসপত্র নিজেদের দেশে নিয়ে বিক্রি করতো। পরেরবার আবার আসতো। এভাবেই এসেছিলো ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়ে। এই ব্রিটিশরা আমাদের দেশে এসে বললো, 'আমরা ব্যবসা করতে এসেছি।' কিন্তু অচিরেই তারা খারাপ লোকদের সাথে মিশে

আমাদের দেশ দখল করে নেওয়ার ফন্দি আঁটলো। বাংলাদেশের শাসক তখন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তিনি ব্রিটিশদের চালাকি বুঝে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি একলা আর কি করবেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ব্রিটিশদের সাথে পলাশীর মাঠে তুমুল যুদ্ধ হলো তাঁর। যুদ্ধে তিনি হেরে গেলেন। আর বাংলাদেশ হারালো তার স্বাধীনতা। নিজ দেশে পরাধীন হয়ে গেলো এ দেশের মানুষ। আমাদের অনেক মানুষকে হত্যা করলো ব্রিটিশরা। আমাদের সব সম্পদসমূহ তারা কেড়ে নিয়ে গেলো তাদের দেশে।

এদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ শোষণ বজায় রাখার জন্য আমাদের দেশের লোকদের মাঝ থেকে কিছু লোককে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করলো। এই লোকগুলো এদেশের মানুষ হয়েও সর্বদা ব্রিটিশ প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য যে কোনো ধরনের অন্যায় ও অপকর্ম করতে পিছপা হতো না। নিজেদের স্বার্থে এদেশের সকল মানুষকে ভূমিহীন করে, ব্রিটিশরা সারা দেশের জমি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে। এদের হাতে তুলে দেয়, এদের বলা হতো জমিদার। এই জমিদাররাই আমাদের দেশের সমগ্র এলাকা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে শাসন করা শুরু করলো।

সারাদেশের মতো টাঙ্গাইলের সন্তোষও জমিদারগণই শাসন করতো। মাওলানা ভাসানী হুজুর সন্তোষের জমিদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সন্তোষের বিভিন্ন স্থাপনা উদ্ধার এবং জমিদারদের অত্যাচার উৎপীড়ন নিপীড়ন, জুলুম, নির্যাতন থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত হন।

এবার মাওলানা ভাসানী হুজুরের জীবন ও সন্তোষকে নিয়ে তার স্বপ্নের খানিকটা কথা তুলে ধরছি।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার সয়া ধানগড়া গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান এবং মায়ের নাম মজিরন বিবি। মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং এগারো বছর বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর আবদুল হামিদ খান তাঁর এক জ্ঞাতি চাচার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। চাচার বাড়িতে থেকে আবদুল হামিদ খান প্রথমে মক্তবে এবং পরে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুজুর শুধু বাংলাদেশেই নয়, তিনি ছিলেন আফ্রো-এশিয়া ল্যাতিন আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত গরীব মেহনতি মজলুম মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন অত্যাচারী জালেম স্বৈরাচারী শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর ত্রাস। এদেশের বঞ্চিত অধিকার হারা মজলুম মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক,

ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ মুক্তির জন্যে মাওলানা ভাসানী যে দুর্বার আন্দোলন করে গেছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এদেশের জনগণের হৃদয়ে তা চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

মাওলানা ভাসানী আমাদের মতই সংসারজীবী মানুষ হয়েও কি করে এতো বড় আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। তার প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি কথা ও প্রতিটি আন্দোলনের বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন।

মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুজুরের জীবনী বিশ্লেষণে জানা যায়, তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীন অন্যান্য সাধারণ টেকনিক্যাল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, ভাসানী হুজুরের মৃত্যুর পর সন্তোষের উন্নয়ন যেন মনে হচ্ছিল থেমে যাচ্ছে। অনেকটা সন্তোষ যেন নিরবে কাঁদে। মাওলানা ভাসানী হুজুরের স্বপ্ন বা ইচ্ছে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলেও পরবর্তীকালে সদাশয় সরকার সন্তোষের মাটিতে ভাসানী হুজুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপর থেকেই সন্তোষের মাটি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং নতুন নতুন দালান-কোঠায় ভরপুর হয়ে জ্বলজ্বল করে হাসছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কিশোর মাওলানা ভাসানী – আবদুল হাই শিকদার
২। মোহাম্মদ হোসেন, চেয়ারম্যান– ভাসানী একাডেমি।

মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও তাঁর ব্যক্তি-জীবন

সৈয়দ ইরফানুল বারী

আজ ১২ নভেম্বর। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে এমনি একটি ১২ নভেম্বর আমাদের জীবনে এসেছিলো। যে শিরোনাম নিয়ে এ লেখা শুরু করেছি, মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও তাঁর ব্যক্তি-জীবনাচার এমনই একাকার হয়ে আছে যে, একটি থেকে আরেকটি আলাদা করা যায় না। এই দৃষ্টান্ত দুটি বিষয়কে একীভূত করেছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে মাওলান ভাসানী কেবল রাজনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিকতা অবলম্বন করেছেন তা নয়, অত্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের দুর্দশা থেকেও তিনি রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর দিবাগত রাতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম জলোচ্ছ্বাস হয়। সাধারণত সাগরের পানি উপকূলের বসতি অতিক্রম করে না কিন্তু সেবারে সাগরের পানি উপকূল থেকে ১০/১৫ কিলোমিটার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। তদুপরি জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা সাধারণভাবে থাকে ৪/৫ফুট কিন্তু এবারে লোনা পানি ভাটার টানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও পশু সম্পদ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শেষ হিসাবে দেখা গেলো ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আজকালকার মতো

দেয়া সম্ভব ছিলো না। ঘরে ঘরে রেডিও ছিলো না। রাতের অন্ধকারে সাগরের পানি কতবড় ধ্বংসযজ্ঞ করেছে তা বুঝতেও এক সপ্তাহ লেগে গেছে।

জনপদের এহেন দুর্দশায় একমাত্র নবতিপর মাওলানা ভাসানীকে দেখা গিয়েছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করার। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমাকে তিনি সঙ্গী করেছিলেন। হাতিয়া, রামগতি, ভোলা, চর মনপুরা, চর আলেকজান্ডার, চর জব্বার অর্থাৎ সবচে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত বিধ্বস্ত পদব্রজে দুর্দশাগ্রস্ত দুর্ভোগের মানুষগুলোকে সরেজমিন দেখেছিলেন। সে দিনগুলো ছিলো রোজার মাস। মাওলানা ভাসানী নামকা-ওয়াস্তে সেহরি খাচ্ছিলেন নৌকার মাঝিদের সাথে। রোজামুখে হাঁটছিলেন। অবসন্ন দেহ। ১০ নভেম্বর থেকে ঢাকার ধানমণ্ডিতে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা মানেননি। এত কঠোর পরিশ্রমেও তিনি প্রসন্ন ছিলেন নিজের সম্পর্কে এই ভেবে যে, তাহলে আমি হক্কুল ইবাদ আদায় করতে পেরেছি। ভোলা থেকে লঞ্চ যোগে ২২ নভেম্বর ঢাকায় ফিরে এলেন। ২৩ নভেম্বর পল্টনে জনসভা করলেন। জনসভার বিবরণ রিপোর্টারের কলমে জনপদের হাহাকার ততটুকু আসেনি যতটুকু ঐ সময়ের প্রধান কবি শামসুর রহমান তাঁর 'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতায় ধারণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি–

'শিল্পী, কবি, দেশি কি বিদেশি সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান,অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানী,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় উড়ে। বুক তাঁর বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হুহু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলীময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুড়ে সারা খাঁ খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমিষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়; ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।
ঝাঁকা মুটে, ভিখারী, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,

শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশি কি বিদেশি সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানী
সমস্ত দোকানপাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ
ধাবমান রিকসা, ট্যাক্সি, অতিকায় ডবল ডেকার
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, দপ্তর
যাচ্ছে ভেসে; যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
হায়! আজ এ কি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।
বল্লমের মত ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতিদ্রুত স্ফীত হয়; স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবী
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবী দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।'

রাজনীতি বলতে মাওলানা ভাসানী যা করেছেন, তাঁর বিবেচনায়, তিনি হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ সৃষ্টির হক আদায় করেছেন। ভুল বুঝা হবে মাওলানা ভাসানীকে, যদি মনে করা হয়, তিনি নিছক রাজনীতি করেছেন। সন্তোষের দরবার হলে তিনি আমাদের ক্লাস নিতে গিয়ে বলেছেন, রাজনীতিকে তুমি যদি ইবাদতে উন্নীত করতে পার, তাহলে তোমার রাজনৈতিক সব কর্মকাণ্ড হক্কুল ইবাদে হবে রূপান্তরিত। তখন তুমি রাজনীতি করছো ইহকালের শুধু নয়, পরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্যেও।

মাওলানা ভাসানীর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। ঢাকার পল্টনে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে উপর্যুপরি ২টি জনসভা করেছিলেন মাওলানা ভাসানী। ২৩ নভেম্বর দক্ষিণ বঙ্গে হাহাকার তুলে ধরে বললেন, আর নয় পাকিস্তান। মানুষের প্রয়োজন পূরণ তো দূরের কথা, জানাজা পড়ানোর মাধ্যমে ফরজে কেফায়া আদায়টুকু পর্যন্ত হলো না, শুধু চোখের দেখা দেখতেও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সাইক্লোন বিধ্বস্ত জনপদে কেউ আসলো না। সে সভার দুটি উক্তি বিখ্যাত হয়ে গেলো। বললেন, ওরা কেউ আসেনি। মাওলানা বললেন, একটি আদর্শের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও ২৩ বছরে প্রমাণিত হলো: আদর্শের চেয়ে মানুষ বড়। অর্থাৎ পাকিস্তান নয়, মানুষ বড়। ৪ ডিসেম্বরের জনসভা ছিল পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক। তিনি যে স্লোগান দিয়ে সভা শুরু করেছিলেন, তা দিয়েই শেষ করেছিলেন। সোল্লাসে বলেছিলেন, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ'। ৪ ডিসেম্বর তিনি আরও বললেন, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করলেই আমরা হবো স্বাধীন, সার্বভৌম। সদিচ্ছা থাকলে কোনো রক্তপাতের দরকার হবে না। কার্যত যা হয়েছিলো তা আমাদের সবার জানা।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর দিবাগত রাতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস হয়। মাওলানা ভাসানী ১৫ নভেম্বর রাতেই ছুটে যান চট্টগ্রাম। সেখান থেকে হাতিয়া, রামগতি, ভোলা। রামগতি থানাধীন একটি গ্রাম চিতলখালী। এরই একটি পুকুর ভরাট ছিল মানুষের লাশে। পুকুর পারে বসে মাওলানা ভাসানী আল্লাহ আল্লাহ বলে আহাজারি করেন। দুর্গন্ধে টিকা যাচ্ছিল না। তবু মাওলানা বসলেন, কাঁদলেন। আমিও তাঁর পেছনে বসে নাক-চাপা রেখে বসে থাকলাম। হুজুরের ডানে বসে আছেন চট্টগ্রামের ন্যাপ-নেতা মরহুম বজলুস সাত্তার।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২নভেম্বরের সাইক্লোনের প্রেক্ষাপটে তাঁর ব্যক্তি জীবনাচার ছিল মানবিক। শুধু মানবিক নয়, আধ্যাত্মিকও, পাশাপাশি যে সুফল তিনি লাভ করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক। প্রখ্যাত সাংবাদিক-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অতীত দিনের স্মৃতি'- তে লিখেছেন, লাইন সিস্টেম বিরোধী এবং বাঙ্গাল খেদা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে আসামে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির ত্রাণকর্তা হিসেবে মাওলানা ভাসানী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, যতদিন এ আন্দোলন অব্যাহত ছিল ততদিনই তিনি রোজাদার ছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন, যেদিন জানলেন মাওলানা ভাসানী এভাবে রোজা রাখছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সেদিনটি ছিল ৬১তম রোজা রাখা দিন। বাঙালি জনগোষ্ঠীর আসামে অবস্থান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রোজা রেখেই যাবেন। মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতা, বিবৃতি পড়ে সবার মনে হতো, সঠিক কারণেই মনে হতো, মাওলানা ভাসানী সদা-সর্বদা আক্রমণাত্মক, বিদ্রোহী, বিপ্লব তাঁর ইস্পিত লক্ষ্য। কিন্তু দেখা যেত, যখনই আতিথেয়তার পর্যায় বর্ণনা লিখেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ওয়ালিউল্লাহ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ ও ৪ মার্চ আসামের ধুবরিতে মাওলানা ভাসানীর আহূত বহুমুখীন সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ৪টি সংগঠন। যেমন, (১) বাংলা-আসাম সাহিত্যসেবী সঙ্ঘ, (২) বাংলা-আসাম মুজাহিদ বাহিনী, (৩) বাংলা-আসাম ন্যাশনাল গার্ডস, (৪) বঙ্গ-আসাম প্রজা সাধারণ। এ সম্মেলনে মাওলানা যুদ্ধংদেহী ছিলেন। কারণ এ সম্মেলনে স্বাধীন বাংলা-আসাম রাষ্ট্রগঠনের দাবি, যা ছিল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব, প্রচণ্ড শক্তিতে উচ্চকিত হয়। এ সম্মেলনের সুফল এতটুকু হয়েছিল সিলেট জেলা গণভোটের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্তি।

দু'দিনের সম্মেলনে কোলকাতা থেকে মাওলানার আমন্ত্রণে নামজাদা রাজনীতিক ও সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলন শেষে ঐ বিশিষ্ট মেহমানগণ মাওলানার নিকট থেকে বিদায় নিবেন কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ভাবলেন সম্মেলনের চাপে নিশ্চয়ই তিনি ক্লান্ত।

হয়তো ঘরোয়া পরিবেশে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এর মধ্যে একজন ভলান্টিয়ারের চিৎকার শোনা গেলো, হুজুরকে পাওয়া গেছে। কোলকাতার মেহমানগণ ছুটে চললেন। ভলান্টিয়ার তাঁদেরকে যেখানে নিয়ে গেলেন, সেখানে পৌঁছে তাঁদের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা দেখলেন সংগ্রামী মাওলানা ভাসানী একটি বড় ইন্দারা থেকে একাই পানি তুলছেন। ৮/১০টি বালতি ভরে আছে পানিতে। মাওলানা মেহমানদের বললেন, 'তোমাদের গোসলের জন্য পানি তুললাম। কোলকাতা থেকে এসে সম্মেলনের তোড়জোড়ে তোমরা গোসল করতে পারোনি। ইন্দারার পানি গোসলের জন্য খুব আরামদায়ক। গোসল কর, খাওয়ার কাজ শেষ কর, তারপর তো যাবে।' এ কর্ম ছিল মাওলানা ভাসানীর বিনয়। আমাদেরকেও বলেছেন, জালিমের মোকাবিলায় তুমি অবশ্যই মারমুখী হবে, উদ্ধত হবে কিন্তু ক্ষুধার্ত সেই জালিমকে অতিশয় বিনয়ের সাথে আপ্যায়ন করবে।

মাওলানা ভাসানী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম প্রাদেশিক পরিষদে Member of the Legislative Assembly নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ থেকে তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি। ১৯৩৫ থেকে তিনি বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষার্থে লাইন সিস্টেম বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। জনগণ তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল কিন্তু জমিদারগণ তাঁকে মোটেই গ্রহণ করেনি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা ভাসানীর ব্যক্তি-জীবনে একটি ঘটনা ঘটে। ব্রহ্মপুত্র নদের এক পারে ভাসান চর, অপর পারের এলাকা শালমারা নামে পরিচিত। শালমারা এলাকা আসামের গৌরীপুরের জমিদার প্রভাত কুমার বড়ুয়ার অধীন ছিল। শালমারায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাওলানা ভাসানী একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। তিনি হাইস্কুলটির নামকরণ করেন 'প্রজাবন্ধু হাইস্কুল'। এতে জমিদার প্রভাত কুমার বড়ুয়া ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। মাওলানাকে জমিদার ২টি কারণে স্কুল ভেঙে নিতে বলেন। প্রথমত, যে জায়গায় স্কুল করা হয়েছে তা তার জমিদারভুক্ত। মাওলানা ভাসানী জমিদারের অনুমতি না নিয়েই স্কুলের পত্তন করেছেন। দ্বিতীয়ত, স্কুলের নামকরণ করেছেন 'প্রজা' নামে। রাজার নামে প্রতিষ্ঠান হবে। প্রজার নামে কেন? এই জেদাজেদিতে উভয়ের লাঠিয়াল বাহিনীর মধ্যে থেকে সংঘর্ষ হতে থাকে। এমন দিনগুলোর মধ্যে মাওলানার প্রথম সন্তান দশম বর্ষীয় আজিজ-উল হক খান টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। ভাসান চরের বাড়ি থেকে প্রতিদিন সকাল বিকাল বেগম ভাসানী খবর পাঠাচ্ছেন, ছেলেটার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেকালে টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা ছিলো না। মাওলানার মাথায় এ খবর যেন স্থানই পাচ্ছে না। স্কুল রক্ষা করতে হবে। দিবারাত্রি এই এক চিন্তা। যেদিন খবর পেলেন জমিদার প্রভাত কুমার বড়ুয়া তাঁর হাতির দলকে মদ খাইয়ে মাতাল করে স্কুল প্রাঙ্গণে লেলিয়ে দিবেন এবং অনায়াসে স্কুল ভেঙে চুরমার করে যাবে– সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে

মাওলানার কাছে খবর এলো, প্রিয় পুত্র আজিজুল হক খান আর নেই, বেগম ভাসানী দাবি জানালেন, অন্তত ছেলেটার জানাযা ও দাফনকর্ম সেরে যান– তাতেও মাওলানা সায় দিলেন না, বলে দিলেন তোমরা সব সম্পন্ন করে ফেল, স্কুল রক্ষা করার পর আমার যাওয়া হবে। বড়ুয়া জমিদারের মাতাল হাতি বাহিনীর মোকাবিলা করতে সম্মুখ সমরে নেমেছিলেন মাওলানা ভাসানীর 'রামদা' বাহিনী। প্রথম সন্তানের কচি মুখখানা দেখা হলো না, তবু তো স্কুলটি রক্ষা পেলো। 'প্রজাবন্ধু' নামকরণ টিকে গেলো। স্মরণ করতে হয়, মাওলানা হুজুরের সেই দুর্দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জমিদার-পুত্র প্রমথেশ বড়ুয়া। পিতার বিরুদ্ধে ভাসানীর পক্ষে ভূমিকা রেখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি করা এবং বোম্বে ফিলমের সে সময়ের জনপ্রিয় নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া। আমাদের জানার সুযোগ ঘটেনি কি প্রমথেশের মধ্যে নিজ পুত্রে স্থান করে দিয়েছিলেন?

মাওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে কৃষক-খাতক-প্রজা সম্মেলন বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে আছে। দলীয় রাজনীতিতে কাউন্সিল অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মাওলানা হুজুর প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন সম্মেলনে। সম্মেলনগুলো হতো যেন গণ-আদালত। তাৎক্ষণিক বিশ্ব-পরিস্থিতি, নিজ দেশের অবস্থা কেমন, সবটুকু সম্মেলনে উপস্থাপন করা হতো। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও সম্মেলনে গুরুত্ব পেত। একজন স্থানীয় কৃষক নেতা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের এক সম্মেলনে বললেন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অবসান ঘটাতে হবে। কৃষকের গরু অভ্যস্ত মাটির গামলায় পানি পান করাতে কিন্তু সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে কুমারগণ জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সেজন্য কৃষক মাটির গামলা পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে সিমেন্টের গামলায় গরুকে খাওয়াচ্ছে। এতে গরুর জিহ্বায় অজানা রোগ দেখা দিচ্ছে। সম্মেলন শেষে মাওলানা ভাসানী প্রত্যন্ত গ্রামে বের হলেন।

প্রথমেই গোয়াল ঘরে যেতেন। এক হাতে গরুকে হা করিয়ে আরেক হাতে গরুর জিহ্বা পরখ করতেন। আমি কিছুই বুঝলাম না, শুধু তাকিয়ে দেখলাম। ২ সপ্তাহ পর সব বুঝলাম। পল্টনের জনসভায় মাওলানা বললেন, সাম্প্রদায়িকতায় কৃষকের গরুও ক্ষতিগ্রস্ত। কুমারেরা তাদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কারসাজিতে দেশান্তর হচ্ছে। সিমেন্টের গামলায় নয়, গরুর জন্যে মাটির গামলা ব্যবহার করতে হবে। মাটির গামলা পেতে কুমারদের নিরাপত্তা দিতে হবে। সেজন্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে। মাওলানা ভাসানী এভাবেই কৃষকের ক্ষুদ্র সমস্যাকেও পল্টনের আলোচ্য বিষয় করতেন। কৃষকের গরু, নিজের পালিত গরু বিষয়ে মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিনাজপুরের বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ নূরুল হুদা কাদের বক্স (ছুটি ভাই) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিতে সন্তোষে এসে

হুজুরকে বললেন, দিনাজপুরের দেবীগঞ্জে জনসভার আয়োজন করে এসেছেন। হুজুরকে নিয়ে যাবেন। এমনটি হামেশাই হতো কিন্তু এবারে মাওলানা হুজুর, ছুটি ভাইকে বললেন, আমার গাভীর বাছুর প্রসবের মাত্র ৪/৫ দিন বাকী। বাছুর প্রসবের সব কাজ আমি নিজ হাতে করি। তাই ছুটি, যাও, সবাইকে বলো গিয়ে, বাছুরটির কাজ সেরে আমি প্রথম দিনাজপুরেই যাবো।

এত যিনি দেশ-দরদী, এত যিনি পশু-দরদী, মানবপ্রেমিক, তাঁকে ভুল বুঝা হয়। মৃত্যুর মাত্র ৬ মাস আগে ফারাক্কা লং মার্চ করলেন। ভারতের পানি আগ্রাসনের মোকাবিলায় তিনি চাইলেন গণ-জাগরণ। একক দায়িত্বে ও নেতৃত্বে কিছু তো করলেন। তখনো তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঢাকার পিজি হাসপাতাল থেকে একরকম পালিয়ে চলে গেলেন রাজশাহী। পৌঁছেই বললেন, তুরস্কের ইস্তাম্বুলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের কনফারেন্স চলছে। এবার বুঝলাম, কেন রাজশাহী আসার এতো তাগিদ। রাজশাহী থেকে অর্থাৎ লং মার্চের যাত্রা শুরুর শহর থেকে মাওলানা ভাসানী রাষ্ট্র-প্রধানদের টেলিগ্রাম মারফত ফারাক্কা সমস্যা অবহিত করলেন।

আমি ঘটনার বিবরণ দিয়ে মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি। আর তাঁর ব্যক্তি জীবন! কখনো এর বাইরে নয়। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-যাপন সর্বজনবিদিত। ত্যাগ-ই তাঁর জীবন। ভোগ-বিলাস নয়। ব্যক্তিজীবনে তিনি যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনীতিক এবং একই সাথে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু যিনি শোষণ ও জুলুমকে কোনোদিন আশ্রয়-প্রশ্রয় দেননি।

[মাওলানা ভাসানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজিই বিভাগ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও তাঁর ব্যক্তি-জীবন' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত।]

লেখক: কোর্স টিচার, মাওলানা ভাসানী স্টাডিজ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

*পশ্চিমের শূকর সাদা হইতে পারে আর পূর্বের শূকর কালো হইতে পারে, সব শূকরই হারাম। শোষণ ছাড়া শোষকের কোনো ধর্ম নাই। কোনো জাত নাই।

*আমি মানুষকে দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি, যে মানুষ কাঁদিতেছে, সে-ই বিদ্রোহ করিতেছে। আমি দেখিয়াছি, যে মানুষ নিচু তলার আঁধারে পচিতেছে, তাহারাই বুলেটের মুখে আত্মাহুতি দিতেছে।

– মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন ও কর্ম

অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান

আফ্রো-এশিয়া ল্যাতিন আমেরিকার অবিসংবাদিত মজলুম জননেতা, বাংলার মুকুটহীন সম্রাট, অসহায়-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পক্ষে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার সয়া ধানগড়া গ্রামের এক বনেদী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শরাফতউল্লাহ খান এবং মাতার নাম মজিরন বিবি।

পাঁচ বৎসর বয়সে মক্তবের ওস্তাদের কাছে তাঁর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়। বাবা-মায়ের আদর তিনি বেশিদিন পাননি। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে বাবা এবং বারো বৎসর বয়সে মাকে হারান। তাঁর আরও দুই ভাই আমীর আলী খান ও ইসমাইল খান অকালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবিত রইলেন তিনি এবং তাঁর এক বোন। বাবা-মার মৃত্যুর পর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চাচা ইব্রাহীম খানের বাড়িতে আশ্রয় নেন। চাচা তাঁকে সিরাজগঞ্জ শহরের এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন কিন্তু পড়ালেখায় মন বসেনি তাঁর। ক্লাসের বাধ্যকতা তাঁর ভালো লাগতো না। সেখানে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এখানে

পড়ালেখা ছেড়ে খেতমজুরের কাজে যোগ দেন। এ সময় এলাকায় বাগদাদ থেকে আগত বোগদাদী পীর তাঁকে দেখে খুশি হলেন। ভাসানীকে তিনি সঙ্গে করে ময়মনসিংহের বল্লা গ্রামে নিয়ে যান। ময়মনসিংহে তিনি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। মক্তবের পড়া শেষ করে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শিক্ষকতা শুরু করেন। মাদ্রাসার শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে তিনি টাঙ্গাইলে চলে আসেন এবং কাগমারীতে অবস্থান নেন। এখানে এক বৎসরকাল থাকার পর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পীর সাহেবের সঙ্গে আসাম চলে যান। তখন সারা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছিলো। ভাসানী ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

পীর সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি দেওবন্দে চলে যান। দেওবন্দ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এখানে থেকেই সম্পূর্ণরূপে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। দেওবন্দে শিক্ষাজীবন শেষ করে মাওলানা ভাসানী আবার আসামে ফিরে আসেন। মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যে পীর বোগদাদী সাহেব আসামের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে ইসলাম প্রচার মিশন স্থাপন করেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বোগদাদী সাহেবের মোসাফিরখানায় 'হককুল্লাহ ও হককুল' ইবাদ মিশনের কাজ জোরে-সোরে চলতে থাকে। ভাসানী ছিলেন তাঁর যোগ্য সাগরেদ। বোগদাদী 'বড় হুজুর' এবং ভাসানী 'ছোট হুজুর' নামে পরিচিতি পান। তখন থেকে তিনি মাথায় তালের টুপি ব্যবহার করতে থাকেন। তিনি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং মিশনের কাজ নিয়ে বগুড়ার পাঁচবিবিতে চলে আসেন। এখানে জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ভাসানী জমিদার সাহেবের ছেলে-মেয়েদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব পান। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আসাম আঞ্জুমান ওলামার সভাপতি নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আসাম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে পা বাড়ান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে দশমাস কারাভোগ করেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর ডাকে 'খেলাফত আন্দোলনে' এবং একই সময়ে দেশবন্ধুর ডাকে 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগদান করেন। আবার গ্রেফতার হন তিনি এবং সাতদিন পর মুক্তি লাভ করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গ ও আসামে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়।

সেখানে বিপন্ন মানুষের সেবায় এগিয়ে গেলেন মাওলানা ভাসানী। কলকাতা থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসুসহ আরও অনেকেই বন্যাপীড়িত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিনরাত দুস্থদের সেবা করতে থাকেন।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তিনি কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের কাছে দেশের নিরীহ প্রজাদের উপর জমিদারদের জুলুম আর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। এতে দেশের সকল জমিদারের কাছে বিরাগভাজন হন। আত্মরক্ষার তাগিদে আসামের ধুবড়িতে চলে যান। আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে আশ্রয় নেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার জমিদার শামসউদ্দিনের কন্যা আলেমা খাতুনের সঙ্গে শুভ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে আসামের ভাসানচরে চলে যান। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষকপ্রজা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলন করেন। সংগ্রামের মাধ্যমে আসামে ব্রিটিশ সরকারের লাইনপ্রথা ভঙ্গ করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বাস্তুহারা বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী তাঁকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। ভাসানচরে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'ভাসানী' নামে খ্যাত হন। একদিকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে দেশীয় জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সন্তোষের কাগমারীতে এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলনের আহ্বান করলেন তিনি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন ।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনে আসাম পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো- লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বেশ কিছু স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব নির্মাণ ও মসজিদ নির্মাণ কাজ। আসাম ছিলো এক বিস্তৃত বিরান ও জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল। পূর্ববাংলা থেকে বাঙালি কৃষকগণ সেখানে গিয়ে বন কেটে চাষাবাদ শুরু করে। প্রথমে আসামের আদিবাসীরা ব্যাপারটাকে স্বাগত জানালেও পরে বাঙালিদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। আসামে বাঙালিদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে লাইনপ্রথা নামে এক কালাকানুন জারি করে। অসমীয়রা 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে। এই লাইনপ্রথা 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে আসামের বারোটি জেলায় মুসলিম লীগের সংগঠন আরও জোরদার হয়। একই বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আসামের ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৩১টি আসন লাভ করে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসাম আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আসাম থেকে রিলিফ নিয়ে বন্যা প্লাবিত পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইলে আসেন এবং পীর হযরত শাহজামান

(রহ.)-এর মাজারে ঘাঁটি করেন। শাহজামান (রহ.)-এর মাজারে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু সন্তোষ জমিদারদের চক্রান্তে আবার আসাম চলে যান।

মুসলিম লীগ মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হবার পরও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লাইনপ্রথা ও 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। কেন্দ্রীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁকে নিজ দলীয় সরকারের বিরোধিতা না করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর আদর্শে অটুট থাকেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রংপুরের গাইবান্ধায় কৃষকপ্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। আসামের লাইনপ্রথা বিরোধী আন্দোলন থেকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একমুহূর্তও সরে যাননি। পুলিশ বাঙালিদের মিছিলের উপর গুলি চালালে একজন নিহত হয় এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন ভাসানী গৌহাটি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ছাড়া পেয়ে তিনি সিলেটে চলে আসেন। পাকিস্তানের পক্ষে আন্দোলন করেন। সিলেটবাসী গণভোটে পাকিস্তানকে রায় দেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আসাম সরকার মাওলানাকে মুক্তি দিয়ে আসাম ছাড়ার নির্দেশ দেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উপ-নির্বাচনে অংশ নেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের মনোনীত প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন ষড়যন্ত্র করে এই উপ-নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যাতে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন সেজন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নতুন আর একটি দল গঠন করার উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্যেই ২৩ জুন ঢাকার 'রোজ গার্ডেনে' তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন। এ সময় তার নেতৃত্বে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়। ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব দেবার দায়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন করেন এবং মুক্তি লাভ করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি জেলা বার লাইব্রেরি হলে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য গ্রেফতার হন। ১৬ মাস কারাভোগের পর পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্য এ.কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা শেরেবাংলা কর্তৃক সরকার গঠন করার পর বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী জার্মানির বার্লিন যাত্রা করেন। এ বছরই ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এবং তাঁর দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে পূর্ববঙ্গের নবনিযুক্ত গভর্নর ইসকান্দার মির্জা ঘোষণা দেন। ১১ মাস লন্ডন, বার্লিন, দিল্লী ও কলকাতায় অবস্থান শেষে তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের একটি উল্লেযোগ্য ঘটনা কাগমারী সম্মেলন। তাঁর একান্ত উদ্যোগে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৮-১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্বপাকিস্তান পশ্চিমপাকিস্তান ও ভারত থেকে বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। এ সকল নেতার নামে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। পূর্বপাকিস্তান পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, গণবিরোধী সামরিক চুক্তি বাতিল এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এই সম্মেলনে তাঁর অনলবর্ষী বক্তব্যে বলেছিলেন, "দাবি মানা না হলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আজ থেকে দশবছর পর এমন সময় আসতে পারে যখন পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে।"

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দাবি প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। তিনি ন্যাপের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করে জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দেশে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২ অক্টোবর মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঢাকায় ৪ বছর ১০ মাস অন্তরীণ ছিলেন। বন্দী অবস্থায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্য, পাটের ন্যায্যমূল্য, বন্যার্তদের পুনর্বাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ৩ নভেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি বা কপ গঠন হলে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাপ তাতে যোগদান করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যাপ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হন চীনপন্থী ন্যাপের সভাপতি, অন্যদিকে মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে ওঠে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ, পিডিপি, ভাসানী ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, কাইয়ুম মুসলিম লীগসহ সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের জন্য আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতামূলক এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দেশে রাজনৈতিক সংকট মীমাংসার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহুত গোল টেবিল বৈঠক (১৯৬৯ খ্রি. ১০-১৩ মার্চ) তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। গণ আন্দোলনের প্রচণ্ডতার মধ্যে আইয়ুব সরকারের পতন হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে ভোটের আগে ভাত চাই, দেশে ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ইসলামী সমাজতন্ত্র কায়েম ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬-৮ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে সন্তোষে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। নির্বাচনের কিছু দিন পূর্বে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকার ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন থেকে ন্যাপ প্রার্থীরা সরে দাঁড়ায়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী পল্টনের এক জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বজ্রকণ্ঠে

বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া '-তাই বলি অনেক হইয়াছে, কিন্তু আর নয়। শেখ মজিবরের দাবি অনুসারে পূর্ববাংলার স্বাধিকার দাবি মানিয়া নাও'।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ভারত চলে যান। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক 'হককথা' প্রকাশ শুরু করেন। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এর বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিব সরকারের সহযোগিতা চান। কিন্তু তা না পেয়ে নিজ দায়িত্বে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিলো এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, যেখানে একজন শিশু ভর্তি হবে, সে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে, পিএইচডি পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারবে। সুচিন্তিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যন্ত তিনি প্রণয়ন করেছিলেন।

তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে সন্তোষে কয়েকবার শিক্ষা সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করেছেন। শিক্ষার্থীগণ যাতে পাঠ্যসূচির পাশাপাশি হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে জাতীয় কারিকুলাম লিখেছিলেন। তিনি স্বনির্বাচিত সিলেবাসে লিখেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ লেখাপড়ার পাশাপাশি বস্ত্রশিল্প, সুতারের কাজসহ সকল কাজ শিখবে। ছাত্রদের হোস্টেলে, লবণ, কেরোসিন বাদে সবকিছু নিজেরা উৎপাদন করতে হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিশু নার্সারি থেকে কলেজ পর্যন্ত করার পরে তিনি চিরবিদায় নেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির কাজ আজ পর্যন্ত সম্প্রসারণ হয়নি। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর লক্ষ লক্ষ অনুসারী রাজনৈতিক ব্যক্তি তা সফল করার কাজে হাত দেননি। শেখ হাসিনার সরকার মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নামে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি গঠন করেন। এ বছর আইন অমান্য আন্দোলন করলে শেখ মুজিব সরকার তাকে সন্তোষে গৃহবন্দী করে রাখে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে ভাসানী তাঁকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে গঙ্গা নদীর উপর ভারতের 'ফারাক্কা বাঁধ' তৈরির প্রতিবাদে তিনি 'লংমার্চ' করেন। এটি ছিলো তাঁর সংগ্রামী জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের পাঁচ এপ্রিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৮ মে তাঁকে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে নেয়া হয় এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানেই তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর লাশ সন্তোষে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।

মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' (১৯৬২), 'মাও সেতুং-এর দেশে' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

একজন মাওলানা ভাসানী

সুলতানা রুবী

মাওলানা ভাসানীকে সরাসরি দেখার সেই ভাগ্য হয়নি কখনও। তবে আব্বার চোখে দেখেছি অনেক বার। তার পানের পিক লাগা ময়লা পাঞ্জাবী, পায়ে জোড়াতালী স্যান্ডেল, মাথায় বেতের টুপি, উচ্চ গলার স্বর; জনসভায় তার বক্তৃতা, হুঙ্কার দিয়ে 'খামোশ' বলা এই দেশের প্রতি, দেশের গরীব প্রজাদের প্রতি তাঁর যে অগাধ প্রেম তা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম উনি সত্যিই মজলুম জননেতা, দেশের নেতা ভাসানী। ছোট বেলায় আমার মেজো কাকা বলতেন, 'উনার নাম ভাসানী কীভাবে হইছে জানস? উনার কিন্তু ভালো নাম আছে সেই নাম হইলো মাওলানা আবদুল হামিদ খান। কিন্তু সবাই উনারে ভাসানী বইলা চিনে তার কারণ জানস?
না জানি না।

উনি যমুনা নদী দিয়া ভাসতে ভাসতে টাঙ্গাইল আইসা উঠছিল এই জন্য সবাই উনার নাম দিছে- ভাসানী। এই গল্পের সত্যতাতো তখন বুঝিনি তাই বিশ্বাস করতাম তবে ভাসানী খুব ভালো মানুষ সব সময় গরীব মানুষের কথা ভাবেন। কোনো সময় সে তার নিজের পরিচয় দেয় না। কারণ পরিচয় দিলে যদি মানুষ তাঁকে বেশি খাতির করে তার জন্য। একবার কী হইছে- টাঙ্গাইল থেকে ভূঞাপুর আসার জন্য রওনা দিয়েছেন। তখন তো পায়ে হাঁটা পথ, গাড়ি চলে না। তখন ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ মানুষ হাঁইটা যাতায়াত করতো। তো

ভাসানী সাবও ২/৩ জন চেলা সাগরেদ নিয়া রওনা দিছেন। সয়া পালিমার কাছাকাছি আইসা পানি পিপাসা লাগছে এই জন্য রাস্তার ধারে এক বাড়িতে আম গাছের ছায়ায় গিয়া বসছে পানি খাইতে। ঐ সময়টায় ছিল বৈশাখ মাস। হঠাৎ তার মনে হইলো একটু কাঁচা আমের ভর্তা হইলে মন্দ হয় না। যে মহিলা কলসি ভরা পানি আর গ্লাস নিয়া আসছে তার কাছে আম ভর্তা খাইতে চাইছেন। মহিলা একটু মনে হয় বিরক্ত হয়েই আমের ভর্তা বানায়া দিছিল। আম ভর্তা খাইয়া যখন রওনা করছেন তখন আসছে এই বাড়ির পুরুষ লোক। আইসাই বলে তুমি কারে আম ভর্তা খাওয়াইছ জানো? উনি মাওলানা ভাসানী। গরীবের বন্ধু তোমার সৌভাগ্য তুমি উনারে আম ভর্তা খাওয়াইছো।

- আহারে আগে জানলে তো ভালো কইরা ভর্তা খাওয়াইতাম। আমি তো মনে করেছি কী এক বেটা আবার আম ভর্তা খাইতে চায়। একটু বিরক্তই হইছি।

- আরে তোমার তো সৌভাগ্য হুজুর তোমার বাড়ির পানি খাইছে, আম ভর্তা খাইছে গর্ব করো বুঝছ। ও তুমি কী বুঝবা মূর্খ মানুষ। উনার এক 'ফু' এ (কথার কথা) মরা মানুষ তাজা হয়। উনি যেমন বড় নেতা তেমনি বড় কবিরাজ, উনার পানি পড়া খুব কাজের। উনি ভবিষ্যত কইতে পারেন। হায়রে মাইয়া মানুষ।

- আপনে আমারে এতো কথা কইতাছেন ক্যান আমি কী উনারে চিনি।

এবার আসি মাওলানা ভাসানীর আসল পরিচয়ে। আমার কাকার কথা অনেকাংশেই ঠিক তিনি যমুনা নদীতে ভেসে না আসলেও উনি সারা জীবনই ভেসে বেড়িয়েছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। যেখানেই অধিকার আদায়ের প্রশ্ন সেখানেই ভাসানী, যেখানে দুর্যোগ সেখানেই

আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত কোথায় নেই তার ভূমিকা। মানুষের মুক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাধিকার আদায় করতে গিয়ে জীবনে অনেকবার জেলে গিয়েছেন, মুক্তির জন্য জীবন বাজি ভাসানী। সারা জীবনই কাজ করেছেন দুস্থ মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় থেকে শুরু করে রাজনীতির এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে তিনি কাজ করেননি। কৃষক শ্রমিক এবং মজলুম মানুষের অধিকার আদায় করে উনি হয়েছেন 'মজলুম নেতা'। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ব্রিটিশ বিরোধী রেখে অনশন করেছেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ মে গঙ্গা নদীর ওপর ভারতের ফারাক্কা বাঁধ তৈরির প্রতিবাদে তাঁর 'লংমার্চ'।

মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী শুধু একজন সংগ্রামী নেতাই ছিলেন না। সাহিত্য সংস্কৃতির এক পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চমানের একজন

দার্শনিকও। দর্শনের উপর তাঁর জ্ঞানের যে পরিধি ছিল তা একটা ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয় তা হলো কলকাতা থেকে তাঁর কাছে কয়েকজন ছাত্র এসেছিলেন। উনারা মাত্র অর্থনীতির উপর থিসিস করছিলেন। সেই সময় মাওলানা ভাসানীর কাছে মাত্র দুই ঘণ্টা বসেছিলেন। তখন তিনি অর্থনীতি নিয়ে যে বক্তব্য রাখেন তা শুনে তারা রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁরা শেষে এও মন্তব্য করেন যে, গত দুইবছর ধরে থিসিসের ওপর যে জ্ঞান অর্জন করতে পারি নি ভাসানীর দুই ঘণ্টার বক্তব্যে তার চেয়ে বেশি জ্ঞান লাভ করলাম।

আমার আব্বা কাকার বলা গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। শেষ করছি আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসলে কীভাবে ভাসানী হয়েছিলেন সেই গল্প দিয়ে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তিনি কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের কাছে দেশের নিরীহ প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচার জুলুমের কথা তুলে ধরেন। এতে দেশের জমিদারদের কাছে তিনি বিরাগভাজন হন। জমিদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি আসামের ধুবড়িতে চলে যান এবং ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে আশ্রয় নেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার জমিদার শামসউদ্দিনের কন্যা আলেমা খাতুনকে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে আবার চলে যান ভাসানচরে। ভাসানচরে থাকাকালীন তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভাসানচরে প্রথম কৃষক আন্দোলন করেন। আন্দোলনের মাধ্যমে আসামে ব্রিটিশ সরকারের লাইন প্রথা ভঙ্গ করেন। বাস্তুহারা বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠি তখন তাঁকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে। সেই ভাসান চরে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে ভাসানী নামে খ্যাত করে ভাসানচরবাসী। সেই থেকেই তিনি মুকুটহীন সম্রাট মাওলানা ভাসানী।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান তিনি না ফেরার দেশে। তাঁর স্বপ্ন ছিল সন্তোষে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে একজন শিশু ভর্তি হবে এবং সে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে এমনকি পিএইচডি পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারবে। এমন কি সুচিন্তিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যন্তও প্রণয়ন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির কাজ আজ পর্যন্তও হয়নি। ভাবতে কষ্ট লাগে তার লক্ষ লক্ষ অনুসারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার এই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেননি। শেখ হাসিনার সরকার মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য, কিন্তু তা ভাসানীর চিন্তাধারা বাস্তবায়নে নয়।

মওলানা ভাসানীর শিক্ষাদর্শন

আল রুহী

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন শুরুতে হয়েছে। যদিও ব্রিটিশ শাসকগণ ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করেন কিন্তু পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অগ্রগতি সাধন করেন। আঠারো শতকে তারা কলকাতায় মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন, কলকাতায় একটি যুগোপযোগী মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে যার প্রিন্সিপাল হন ইংরেজ সাহেব। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায়ও আধুনিকায়ন হতে শুরু হতে থাকে তবে, ইংরেজ শাসকগণ তাদের শাসন কাজের সুবিধার্থে ইংরেজিকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস পায়। উনিশ শতকের শুরুতে ভারতীয় মুসলমানগণ যখন নিজেদের অনগ্রসরতার পেছনের কারণ খুঁজতে গিয়ে শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকাকে দায়ী করেছেন। আর ভারতীয় মুসলমানগণের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে অনেক গবেষক মনে করেন। ফলে অনেক মুসলিম সামন্ত প্রভু ও অভিজাত শ্রেণি শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। তারা নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপন করে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উদাত্ব আহবান জানান। তাদের মধ্যে নবাব আব্দুল লতিফ, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানি, বেগম রোকেয়া, নবাব আলী চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, বাবু রণদা প্রসাদ সাহা, জাহ্নবী চৌধুরানি অন্যতম। তবে, সামন্ত

প্রভুদের বাইরে ভারতীয় উপমহাদেশে একজন কৃষক সন্তান হিসেবে রাজনৈতিক নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসেবক ও শিক্ষা চিন্তক হিসেবে বিবেচিত। তিনি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট না হয়েও বাংলাদেশ ও আসামে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অনগ্রসর বাঙালির জীবনে শিক্ষার আলোর জ্বালাতে প্রয়াসী করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির মুক্তি কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। তাই তিনি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষার উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মানুষ নিজের সমাজের উন্নয়ন, জাতির উন্নয়ন ঘটাতে চায়, শিক্ষার আলো জ্বালাতে চায়; কিন্তু মওলানা ভাসানী যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানে অবস্থান করেছেন। সেখানে নিজের দেশকে ভালোবেসে সকল কিছুকে আপন করে নিয়েছেন। সেখানেই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন ও মানবসেবায় নিজেকে নিবেদিত করেছেন। এখানেই অন্যদের থেকে মওলানা ভাসানীর স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ছাড়া একটি জাতির সার্বিক মুক্তি ও উন্নয়ন সম্ভবপর নয়, তাই তিনি নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশি পড়া লেখা না করলেও জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির ফলে অনেক বিষয়ে বিশেষত রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকতায় তার জ্ঞান অপরিসীম ।

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা চিন্তার প্রেক্ষিত "সাধারণ মানুষ মওলানা ভাসানীকে একজন রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মভীরু মানুষ এবং ধর্মবিদ ও আধ্যাত্মিক গুরু মনে করতেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী শুধু যে, রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মবিদ ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন এক মহান সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। রাজনীতির পাশাপাশি দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসার নিয়ে তার ভাবনা ও শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে গণমানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, তাই নিয়ে তার চিন্তার যেন শেষ নেই। ১৯৫৪-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রায় ১০মাস ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং বিশ্ব বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন খ্যাতি সম্পন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন। মওলানা ভাসানীর ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিদের সমাবেশে মুখরিত হয়েছিল সেদিনের অজপাড়াগাঁ কাগমারী। কাগমারীতে আসর জমাতে এশিয়ার বরেণ্য কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ হাজির হয়েছিলেন। অনবদ্য উপস্থাপনায় হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা বিমুগ্ধভাবে উপভোগ করেছিলেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবনা প্রণয়ন করতে সন্তোষে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলনের আয়োজন করেন। মওলানা ভাসানী লিখিত বক্তব্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্পর্কে বলেন, "পুঁজিবাদের ধারক বাহক উপনিবেশিকতাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে শাসন শোষণ অব্যাহত রাখা ও কেরানি কুল সৃষ্টি করার জন্য যে, শিক্ষা ব্যবস্থা চালু

করিয়াছিল আমরা অন্ধভাবে সেই শিক্ষানীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতার কোনো স্থান নাই। ধর্মীয় শিক্ষার নামে জীবনের সাথে সম্পর্ক বিহীন তথাকথিত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কৌশলে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানো হইয়াছে।" আম গাছ থেকে যেমন আম ফল পাওয়া যায়, জাম গাছ থেকে যেমন জাম পাওয়া যায়, তেমনি মওলানা ভাসানী আরো লিখেছেন, "মদ চোরাইয়ের কারখানা থেকে যেমন কেউ দুধ প্রত্যাশা করে না, তেমনী কেরানি কল ও গোলামীর মানসিকতা সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা হইতে স্বাধীন স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী, সহানুভূতিশীল মানুষ সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী যে সব ব্যক্তি আজ দেশ চালাইতেছে তাহাদের অনেকেই দুর্নীতি, ঘুষ, সুদ, মদ জুয়া ও মদের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের কাছে দেশকে, দেশের মানুষকে বিকাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

আর এ বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী ভাবতে থাকেন কিভাবে একটি জাতির শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন করে নির্ভরশীল জাতিতে রূপান্তরিত করা যায়। কিভাবে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন শিক্ষিত জাতি তৈরি করে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা দূর করে সামনের দিকে ধাবিত করা যায়। শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেন, " নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি জমাট রক্তবিন্দু থেকে এবং জ্ঞান দান করেছি কলমের সাহায্যে, যা সে জানত না। অন্যত্র পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ।"

মূলত শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক জীবন বিকশিত হয়ে উঠে, এ জন্য রুশো বলেন, "Plants are developed by cultivation man Education." গাছ পরিচর্যা করলে বেড়ে উঠে; আর মানুষ বড় হয় শিক্ষায়।

শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Edward thring বলেন, "More Knowledge is not Education."

শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়; আসলে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সুন্দর অভিব্যক্তি হলো শিক্ষা।" দার্শনিক Horne এর মতে;

Education is the sharing of experince a common possession, "অভিজ্ঞতার সহজ সাবলীল বণ্টনই হলো শিক্ষা"

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন;

"The aim education should be the acqution of happiness through approved by action of religion."

শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্মীয় অনুশাসনকৃত অনুমোদিত কার্যাবলীর মাধ্যমে সুখ আহরণ। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দার্শনিক ঋৎড়বনবষ সুন্দর ভাষায় বলেছেন,"The realization of a beautiful faithful and pure life should be the amin of education" একটি সুন্দর ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধিই হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।" কাজেই শিক্ষার সুন্দর সংজ্ঞা ও তার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন জ্ঞানী দার্শনিকগণ শিক্ষা মানুষকে যেমন আদর্শ ও সৎমানুষ হিসেবে তৈরি করে এবং একটি সুন্দর সমাজেরও তৈরির উৎসাহ জোগায়। যে শিক্ষা সৎ মানুষ ও সুন্দর সমাজ বিনিময়ের পথ দেখতে পারে না, তা আসলে শিক্ষা হতে পারে না।

প্রচলিত অর্থে একজন শিশু অক্ষর জ্ঞান থেকে ধাপে ধাপে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে জ্ঞান ও পাঠ্যসূচির পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে জ্ঞান অর্জন করে প্রচলিত অর্থে তাকেই শিক্ষা বলে থাকে। শিক্ষার্থীর শারিরীক মানসিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা এখানে গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ শরীর, মন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয় তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষক জ্ঞান বিতরণ করবেন; ছাত্র বুঝে না বুঝে বিতরণকৃত জ্ঞান গুরুত্ব সহকারে কুড়াতে থাকবেন। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আত্মিক জ্ঞানের যোগাযোগ ঘটে না। যা বিনোদনহীন একটি লেনদেন মাত্র; বলা যায় আনন্দহীন একটি গ্রহণ বর্জনের মত বিষয় ভিত্তিক একটি পদ্ধতি মাত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা থেকে একটি কাজ পাবেন; তা দিয়ে নিজের জীবন-যাপন করবেন। সত্য কোনো আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচলিত বটে, ধারণা করা হয় না। যা একটি ক্ষুদ্র ধারণা মাত্র। কিন্তু শিক্ষার আদর্শ কি সত্যিই তাই?

মোটেই নয় শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে জ্ঞানের জন্য, যে আত্মত্যাগ জীবন ত্যাগ করবে মানব কল্যাণের জন্য তাই হলো শিক্ষা।

মওলানা ভাসানীর সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও জুলাই অভ্যুত্থান প্রেক্ষিত

মো. এনায়েত করিম

মওলানা ভাসানী ছিলেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার একজন রাজনীতিবিদ। তাঁর আদর্শ ছিল বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। জমিদার-খাতক তথা শোষক শ্রেণি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজিত অসম বিবেধের কংক্রিট দেয়াল ভেঙে সাম্যের সমাজ গড়া।

দেওবন্দ দারুল উলুম থেকে সদ্য বের হওয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত মানুষটির প্রথম কর্মজীবনেই তাঁর এই আদর্শিক প্রতিফলন ঘটে। ১৯০৯ সালে তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আসেন এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি অবলোকন করেন জমিদার শ্রেণি কর্তৃক সাধারণ মানুষের প্রতি চরম বৈষম্য। প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠায় রোষানলে পড়েন এতদ্বঞ্চলের প্রতাপশালী শোষক জমিদারের। বাদ যায় না তাকে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্রও। সক্ষম না হয়ে মামলা ঠোকা হয় তার বিরুদ্ধে। স্থানীয় মজলুমের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই শিকার হন জুলুমের। হয়ে ওঠেন তাদেরই একজন। ইসলামী বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত নওজোয়ান সিদ্ধান্ত নেন শোষিত শ্রেণির হয়ে কাজ করার। অনুধাবন করেন সত্যের ঝাণ্ডাধারক কারবালার সংখ্যালঘুদের মহান প্রতিনিধি, শুহাদায়ে কারবালা নবীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের সেই মহান বাণী, 'জালিমের সাথে জীবিত থাকাই একটি মহাপাপ, অবশ্যই জীবন ইমান ও সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়।'

মওলানা ভাসানী সত্যের সুমহান আদর্শকে ধারণ করে আজন্ম সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন। আর এই সংগ্রামের পথই তাঁকে বানিয়ে তোলে মজলুম থেকে একজন মজলুম জননেতা।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন কার্ল মার্কস বা জাতীয়তাবাদ নীতি দ্বারা প্রভাবিত। তবে তিনি শ্রেণি সংগ্রামের আদর্শপুষ্ট না হয়েও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ব্রতই ছিল নিম্নশ্রেণির পক্ষে কথা বলা। ফলে দেশের ধনিক তথা শোষক শ্রেণির মাঝে তাঁর সমর্থক খুব একটা ছিল না। বরঞ্চ এরাই ছিল তার সংগ্রামী জীবনের প্রধান প্রতিবন্ধক। তাঁর বেশির ভাগ কর্মীই ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া অবহেলিত মানুষ। যারা ছিল তাঁর মূল চালিকাশক্তি। বিশিষ্ট লেখক ও ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক-এর মতে, 'তিনি রাজনৈতিক চরিত্রের কারণে জাতীয়তাবাদ নির্ভর গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও

মওলানা ভাসানী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে পূর্বাপর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন এবং ব্যক্তিগত রাজনীতির মূল কর্মকাণ্ড ছিল গ্রাম বাংলার শোষিত জনগণকে কেন্দ্র করে। শ্রেণি সংগ্রামের আদর্শবাদী রাজনীতি সংশ্লিষ্ট না হয়েও নিম্নবর্গীয় শ্রেণির পক্ষেই ছিল তাঁর রাজনীতির তৎপরতা।'

সাধারণ মানুষ তথা খেটে খাওয়া নিপীড়িতের পক্ষে অমিয় বাণী, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছো অপমান/অপমানে হইতে হবে তাহাদের সবার সমান।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটির উপযুক্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'যাহাদের উপর আমাদের দেশের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে দেশকে, সে জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা।'

বাংলা সাহিত্যের অপরাপর দুই শ্রেষ্ঠ কবির মতো আমাদের রাজনীতির কবি মওলানা ভাসানীও চিরদিন এই সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। কখনই আপোষকামীতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি মনে করতেন জালিমের সাথে বেঁচে থাকাটাই পাপ। তিনি জানতেন জুলুমবাজদের সাথে আপোষকামীতা মানে একটি মহাপাপের পথ প্রশস্ততা করা। যে কোনো রাজনৈতিক ইস্যুকে তিনি রাজনীতি দ্বারাই মোকাবেলা করতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ইতিহাসবেত্তা নই, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাষ্যকারও নই। আমি হাড়ে হাড়ে রাজনীতিবিদ থাকতে চাই এবং অহিংসার বাণী নয়, বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে চাই।'

পূর্বেই উল্লেখ করেছি মওলানা ভাসানী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ একজন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ। শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিকতা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শনে বৈচিত্র্যতা দান করেছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদ রাজনীতির সুদূরপ্রসারী বীজ বপন করতে চেয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রতিফলন ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হওয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন হয়েছিল এ সম্মেলনে। ৮ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'এভাবেই যদি পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শাসন-শোষণ চলতে থাকে, তবে আগামী ১০ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আস্সালামু আলাইকুম জানাবে। তোমাদের পথ তোমরা দেখো, আমাদের পথ আমরা দেখব।'

বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা তথা বৈষম্যবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে এই বক্তব্যে, যা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। বস্তুত হয়েছিলও তাই।

তাঁর সুদূরপ্রসারী ও উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই '৭০ এর গণপরিষদ নির্বাচনে। নিজ দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্বাচন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। তিনি জানতেন গণপরিষদে ২০/২৫ টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্ভবপর নয়। এতে বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। তাই তিনি আওয়ামী লীগকে পূর্ণ সমর্থন দেন, যাতে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি বলেন, 'মুজিব ভালো কাজ করছে। ওর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে দেশের ভালো হবে। আমরা সরকার না হলেও অন্তত দেশের জন্য কাজ করতে পারবো।' হয়েছিলোও তাই। এর ফলে '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবির পথ ও প্রেক্ষিত সুস্পষ্ট হয়। যার পরবর্তীতে ফলাফল হচ্ছে '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আমাদের কাঙ্খিত বিজয়লাভ।

বিপ্লব ছাড়া বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্র কায়েম সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী হাড়ে হাড়ে বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। তাইতো আজন্ম তিনি ছিলেন বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত একজন দার্শনিক রাজনীতিবিদ। তিনি বলেছেন, 'গড়িতে হইলে আগে ভাঙিতে হয়। মানুষের মুক্তি আপোষ রফায় আসে না। সুদূরপ্রসারী, কর্মসূচিভিত্তিক বিপ্লবই এর একমাত্র পাথেয়।' স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে সারাদেশ ঘুরে ঘুরে কৃষক-তাঁতি সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করতে ও স্বাধীনতা যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতির কর্মসূচি হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সফর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাইতো দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিল দেশের খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষ। যা ছিল তাঁর উৎপাদক শ্রেণির সাথে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্কের ফল।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেও তিনি বসে থাকেননি। বৃদ্ধ বয়সেও অসুস্থ শরীর নিয়ে সারাদেশ সফর করেছেন। মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করেছেন। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন আমৃত্যু। তিনি বাঙালি জাতিকে বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। তার চেতনা ও দর্শন বাংলার রাজনীতির প্রতিটি পরতে পরতে রেখাঙ্কিত।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শ যুগে-যুগে গণতন্ত্রকামী ও বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যার প্রতিফলন স্বাধীনতাতোত্তর কয়েকটি অভ্যুত্থান। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীন দেশ কয়েকটি গণ-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে। এর মধ্যে বৃহৎ আন্দোলন '২৪ এর ছাত্র-জনতার ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন যা জুলাই অভ্যুত্থান নামে খ্যাত, যা চরম বৈষম্যের শিকার হওয়া আপামর ছাত্র-জনতার দীর্ঘদিনের ক্ষোভের প্রতিফলন। প্রথমে এটি কেবলকালে ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন হলেও পরবর্তীতে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি বর্ষণ ও সরকারের বৈষম্যনীতি দেশের আপামর জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা অবশেষে সরকার পতনের একদফার ডাক দেয়। মেধাবীদের ন্যায্য দাবীর প্রেক্ষিতে গুলির প্রতিদান, স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্টদের '৫৭ সালের মতো 'আস্‌সালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হয়।

কোটা বৈষম্যের বিপরীতে দেশে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমরা মওলানা ভাসানীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাই। স্রোতের বিপরীতে নৌকা বেয়ে চলা আজন্ম যোদ্ধা, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রবর্তক আমৃত্যু বাজিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সুর। সে সুরে জাগরিত নিপিড়িত জনতা। বিপ্লবী মন্ত্রে একেকজন হয়ে ওঠেন মাও সেতুং, চে গুয়েভারা বা লাল ভাসানী।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন বাংলাদেশে সাতান্ন হাজার বর্গমাইলব্যাপী সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিভিত্তিক যে উদার আহ্বান, তা বৃথা যায়নি। দেশের ক্রান্তিলগ্নে বিপ্লবী জনতা এর প্রতিফলন ঘটিয়েছে। '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও '২৪ এর জুলাই আন্দোলন তার প্রমাণ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস বিপ্লবের আকুণ্ঠ প্রত্যাশা। ভাসানী রাজনীতির আদর্শিক বাস্তবায়ন হলেই এ প্রত্যাশার সুফল ও সমবণ্টন হবে। আর তাতেই শোষণ-বঞ্চনামুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে।

লেখক: ভাসানী গবেষক ও কলামিস্ট।